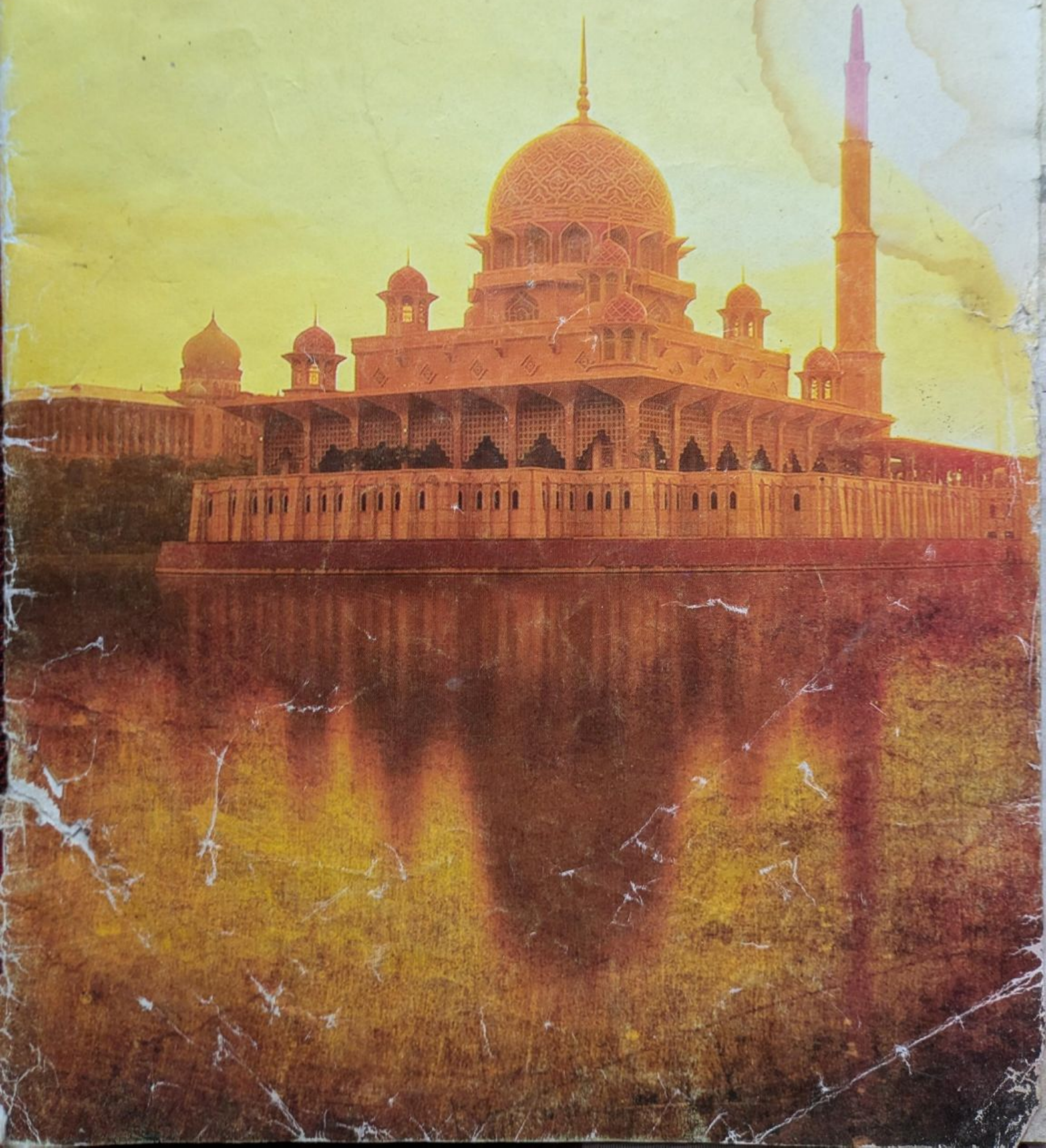


মাসিক

জানুয়ারি-২০১৬

ঈদুল পথ



বিসমিল্লাহীর সহস্রাব্দে রহীম
আল-ইব্রাহীম ইসলামী শাসন
হাই স্কুল.....জিলাল নং.....
পরিচালক এম.এ. আজিজ

মাসিক এক সপ্ত

রবিউসসানী ১৪৩৭। মাঘ ১৪২২। জানুয়ারি ২০১৬

- উপদেষ্টা সম্পাদক
আল্লামা শাইখ ইসমাইল হুসাইন আল-মাদানী
আল্লামা শাইখ সুলাইমান আল-উকাইলী
প্রফেসর ড. নাসরুল্লাহ আল-মানসূর
- সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি
শাইখুল হাদীস আবু আদিল্লাহ মুহাম্মাদ মুসতাফা
- প্রধান সম্পাদক
ড. এবিএম সিদ্দীক
- সহ-সম্পাদক
ইবনু আদিল্লাহ মুহাম্মাদ আদিল
- নির্বাহী সম্পাদক
মুহাম্মাদ তানভীর আহসান
- ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
মু'তাসিম বিল্লাহ আল-মামুন
- শিল্প-সম্পাদক
কাজী বাশীর আহমাদ
- বিতরণ সম্পাদক
আহসান উল্লাহ মাহমুদ

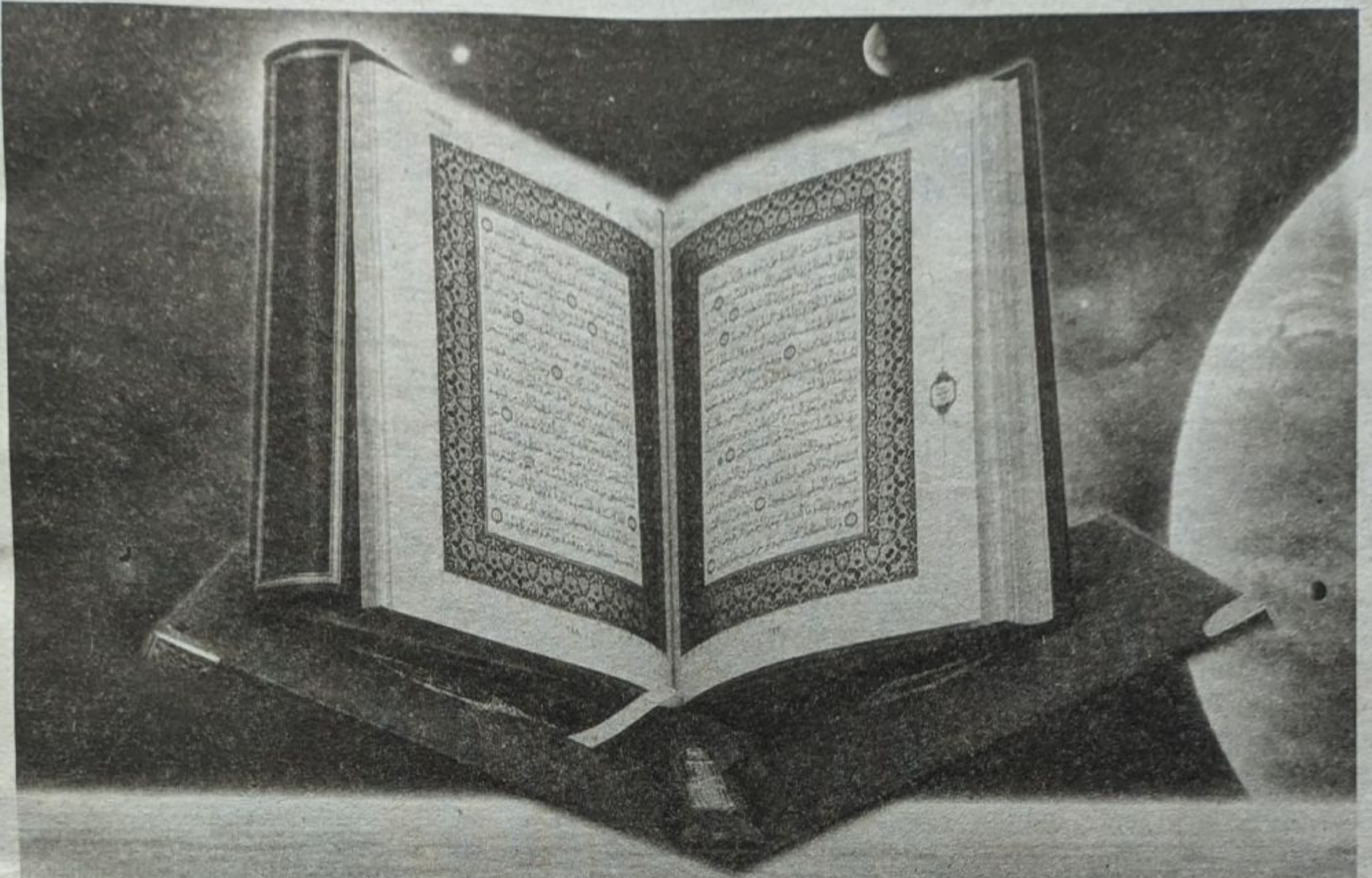
শুভেচ্ছা মূল্য : ২০ টাকা মাত্র

প্রশ্ন, পরামর্শ, মন্তব্য ও
যেকোন প্রয়োজনে
alburqan2015@gmail.com
www.facebook.com/alburqan

সম্পাদক মন্ডলী কর্তৃক আল-বুরকান প্রেস আরামবাগ, ঢাকা থেকে মুদ্রিত
ও প্রকাশনা বিভাগ কর্তৃক বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।

বিন্যাস-সূচি

০৩	২৬
সূরা আসর ও বর্তমান প্রেক্ষাপট	হায়দ্রাবাদ গণহত্যা ভারতে মুসলিম নিধনের চেপে রাখা অধ্যায়
০৫	২৮
ধন-সম্পদের ফিতনা বিপর্যস্ত উম্মাহ	জামাআত ও ইতাআত
০৭	৩০
জিহাদি নয় মুজাহিদ হোন...	তাওয়াক্কুল করার অর্থ কী?
০৮	৩৩
শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম (রহ.) এর উপদেশ	পেপসি : কী খাচ্ছেন একটু ভেবে দেখবেন কি?
১১	৩৬
মুসলিম কারাবন্দিদের পক্ষে কে দাঁড়াবে?	সরকারের সফলতা ও জনতার ভোগান্তি
১৫	৩৮
কখনও ঝরে যেও না	নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস, ওপারেতে সর্ব সুখ আমার বিশ্বাস!
২১	৪০
ইসলামে গোপনীয়তার বিধান	মানসিক রোগাক্রান্ত জাতির স্বপ্নচারী একজন হুমায়ুন আহমেদের গল্প
২৪	৪৩
কারাগারের ভয় আমার নেই কিন্তু কবরে যাবার ইচ্ছাও আমার নেই	আগুন!
	৪৫
	যুক্তির আঘাতে মুক্ত করি চেতনার জট
	৪৭
	কবিতাগ্ন



শাইখুল হাদীস আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ মুস্তাফা

وَالْعَصْرِ* إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ* إِلَّا الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ
وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ*

গত সংখ্যার পর...

মূলত: আশিয়া (আলাইহিমুস
সালাম)-গণের এ পথটাই হলো
রক্তপিচ্ছিল, কষ্টকাকীর্ণ। জাতির
সর্বশেষ 'ভাল' মানুষ হলেন
নবী-রাসূলগণ। অথচ এমন কোনো
নবী বা রাসূল খুঁজে পাওয়া যাবে না
যারা এই কর্মসূচি (ঈমান, আমল,
দাওয়াহ) বাস্তবায়ন করতে গিয়ে বাধার
শিকার হননি। মহান আল্লাহ বলেন,

لَنَبْلُوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ
أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ
ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

অর্থ: অবশ্যই তোমরা শারীরিক ও
অর্থনৈতিকভাবে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে
এবং ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুশরিকদের কাছ
থেকে নানান ধরনের কষ্টদায়ক কটুক্তি
শুনবে। যদি তোমরা এতে সবর কর
এবং (আল্লাহকে) ভয় কর, তাহলে
মনে রেখো, এটাই হলো সাহসিকতার
কাজ। (কুরআন, ৩: ১৮৬)

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ
مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ
الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا
لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ

অর্থ: আর অবশ্যই আমি তোমাদের
পরীক্ষা করব ভয়, ক্ষুধা এবং জান-মাল
ও ফল-ফসলের ক্ষয়-ক্ষতির দ্বারা।
সুসংবাদ দাও সত্যে অটলদেরকে।
(ঈমানের পথে) যখন তাদের উপর
কোনো বিপদ আসে তারা বলে,

সূরা আসর
ও
বর্তমান
প্রেক্ষাপট

নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য, আর তাঁর দিকেই ফিরে যাব। (কুরআন, ২: ১৫৫)

وَإِذْ أَخْبَرْنَاكَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكَ سُوءَ الْعَذَابِ يُقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ

অর্থ: স্মরণ করো, যখন আমি তোমাদেরকে মুক্ত করলাম ফেরাউনের অনুসারীদের দাসত্ব থেকে। তারা তোমাদেরকে সীমাহীন নির্যাতন করতো। তোমাদের ছেলে সন্তানদের হত্যা করতো আর মেয়েদের জীবিত রাখতো। এটাতো ছিল তোমার রবের পক্ষ হতে এক বিরাট পরীক্ষা। (কুরআন, ৭: ১৪১, ১৪: ৬)

الْم أَحْسِبَ النَّاسَ أَنْ يَبْرُكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ

অর্থ: আলিফ লাম মীম। মানুষ কি মনে করে, 'আমরা ঈমান এনেছি' বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে, আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না? আমি তো তাদের পূর্ববর্তীদেরও পরীক্ষা করেছি। এভাবে আল্লাহ জেনে নেন, কারা (ঈমানের দাবিতে) সত্যবাদী আর কারা মিথ্যাবাদী। (কুরআন, ২৯: ১-৩)

هَٰذَا الَّذِي اٰتَيْنَا الْمُؤْمِنُوْنَ وَزَلْزَلُوْا زَلْزَالًا شَدِيْدًا

অর্থ: তখন পরীক্ষা করা হয়েছিল মুমিনদেরকে। আর তারা প্রকম্পিত হয়েছিল ভীষণভাবে। (কুরআন, ৩৩: ১১)

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِيْنَ وَنَبْلُوَ اَخْبَارَكُمْ

অর্থ: অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব, যাতে করে আমি প্রকাশ করে দিই তোমাদের মধ্যে কারা সুদৃঢ় মুজাহিদ। আর আমি পরীক্ষা করব তোমাদের সার্বিক অবস্থাাদিও। (কুরআন, ৪৭: ৩১)

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ - وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ - قَتَلَ أَصْحَابُ الْأَخْذُودِ - النَّارِ ذَاتِ الْوُكُودِ - إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ - وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُودٌ - وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ

অর্থ: শপথ! কক্ষপথ বিশিষ্ট আকাশের। শপথ! প্রতিশ্রুত দিবসের। শপথ! সাক্ষ্যদাতার এবং যার ব্যাপারে

সাক্ষ্য দেয়া হবে তার। ধ্বংস হয়েছে গর্তের অধিপতিরা, (যাতে ছিল) ইন্ধনপূর্ণ আগুন। যখন তারা তার কিনারায় উপবিষ্ট ছিল। আর তারা মুমিনদের সাথে যা করেছিল নিজেরাই তার প্রত্যক্ষদর্শী। তারা তাদেরকে নির্যাতন করেছিল শুধুমাত্র এ কারণে যে, তারা মহাপরাক্রমশালী প্রশংসিত আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল। (কুরআন, ৮৫: ১-৮)

নবী (আ.)-গণের বরকতময় সেই পথে আজও যারা চলবে তাদের উপরও নেমে আসবে অবর্ণনীয় নিপীড়ন। নির্যাতনের স্ট্রীম রোলার। সত্যিকার অর্থে আমরা যখন মানুষকে সত্যের দিকে আহ্বান করব, নবী-রাসূলগণের সেই রক্তমাখা দীনকে আঁকড়ে ধরব তখন আমাদের উপরও চিরন্তন সেই নির্যাতন-নিপীড়ন নেমে আসবে। কারণ আমরা কেউই নবী-রাসূলগণের চেয়ে তো বেশি বুয়ুর্গ নই। যাদের চালচলন, আদব, আখলাক সবচেয়ে উন্নত-মুশরিকরা পর্যন্ত যাদের আচরণ, আমানতদারিতার ব্যাপারে সাক্ষি, সেই নবী-রাসূলগণই পৃথিবীর বুকে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন সবচেয়ে বেশি। হাদীসে এসেছে,

عَنْ مُضْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً؟ قَالَ: الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الصَّالِحُونَ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَلَا أَمْثَلُ مِنَ النَّاسِ يَنْتَلِي الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صَلَابَةٌ زِيدَ فِي بَلَائِهِ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ خُفِفَ عَنْهُ وَمَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَمُتَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ لَيْسَ عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ

অর্থ: মুসয়াব ইবনে সাদ (রা.) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, সবচেয়ে বেশি বিপদের সম্মুখীন হয় কোন্ মানুষ? তিনি বললেন, নবীগণ। অতঃপর সৎলোকেরা। এরপর তাদের নিকটবর্তীগণ। এরপর তাদের নিকটবর্তীগণ। মানুষকে তার ঈমান অনুপাতে বিপদের সম্মুখীন করা হয়। যার ঈমান যত মজবুত, তার বিপদও তত কঠিন হয়। যদি তার ঈমান দুর্বল

হয়, তাহলে তা উপর বিপদও হালকা করা হয়। আর বান্দা সর্বদা বিপদের সম্মুখীন হতেই থাকে। (অটল থাকার ফলে) এক পর্যায়ে বিপদ তাকে এমন অবস্থায় পৌছিয়ে দেয় যে, সে তখন পৃথিবীতে নিষ্পাপ হয়ে চলাফেরা করে। (মুসনাদে আহমাদ: ১৪৮১, ১৬০৭, বাইহাকী সুনানে কুবরা: ৬৭৭২, তিরমিযী: ২৮৩৯, দারিমী: ২৭৮৩, ইবনে হিব্বান: ২৯০১)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِي نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ

অর্থ: আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, মুমিন নারী-পুরুষের ব্যক্তিগত বিষয়ে এবং স্ত্রীয় সন্তান ও সম্পদের উপরে তার মৃত্যু পর্যন্ত বিপদ আসতেই থাকে। আর আল্লাহর সাথে তার এমন অবস্থায় সাক্ষাত হয় যে, তার কোন গুনাহই বাকি থাকে না (বিপদে সবার করার কারণে তার সকল গুনাহ মাফ হয়ে যায় এবং নিষ্পাপ হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়)। (তিরমিযী: ২৩৯৯, ইবনে হিব্বান: ২৯২৪, সিলসিলা সহীহা: ২২৮০, মুস্তাদরাক হাকিম: ৭৮৭৯, কানযুল উম্মাল ৬৭৭৭)

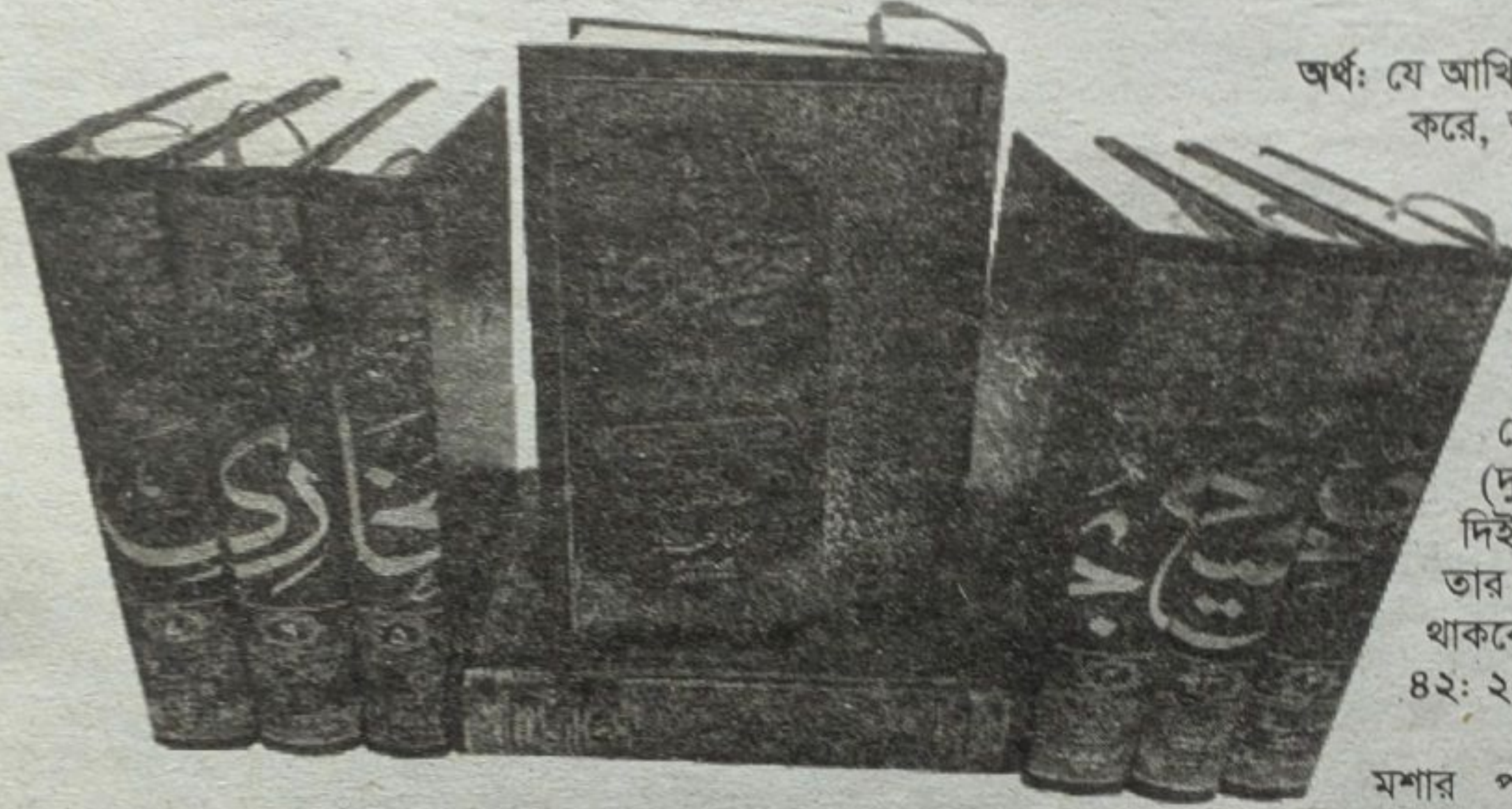
সেই নবুয়তি মিশন নিয়ে, তাওহীদের ঝান্ডা ধারণ করে আমি এসি রুমে বসবাস করব, নাপাক মুশরিকরা আমাকে আঙ্কারা দিবে, ফেরাউনের স্থলাভিষিক্ত তাগুতিরা আমাকে চাকরি দিবে; উচ্চ বেতন, হাই মডেলের গাড়ি, রাজধানীতে মনোরম বাড়ি দিবে- তাহলে আমার মিশনটা কি মুসা (আ.)-এর মিশনের সাথে মিলল? না। অন্য কোনো নবীর সাথে? তাও না। সাহাবাগণের সাথে? শহীদগণের সাথে? সালিহীনদের সাথে? মোটেও না। তাদের সুন্নাহ তো হলো হিজরতের, নিজ মাতৃভূমি ত্যাগের, জেল-যুলুমের, অগ্নিকুন্ডে নিক্ষিপ্ত হওয়ার, লোহার করাতে মাথা দ্বিখন্ডিত হওয়ার, লোহার চিরুনিতে শরীরের গোশত-হাড়ি আলাদা হওয়ার।

চলবে, ইনশা-আল্লাহ...

আল্লাহর ইবাদাত থেকে বিমুখ হওয়া সত্ত্বেও তার রিযিকের এত প্রশস্ততা! জীবন তার এত চাকচিক্যময়! তাই রাসূল জানিয়ে দিচ্ছেন- এ দুনিয়া, দুনিয়ার যাবতীয় বস্তু আল্লাহর কাছে একটা মশার পাখাতুল্যও নয়। তাই কাফিরকে এখানেই দিয়ে দিচ্ছেন। কেননা পরকালে তাদের কোনোই প্রাপ্য নেই। মহান আল্লাহ বলেন,

مَنْ كَانَ يُرِيدُ عِزَّ الْآخِرَةِ نُزِلَ فِي حِزِّهِ
وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ عِزَّ الدُّنْيَا نُزِلَ مِنْهَا وَمَا لَهُ
فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ

অর্থ: যে আখিরাতের ফসল কামনা করে, আমি তার জন্য তার ফসলে (আখিরাতে) প্রবৃদ্ধি দান করি। আর যে দুনিয়ার ফসল কামনা করে আমি তাকে তা থেকে কিছু (দুনিয়াতেই) দিয়ে দিই। কিন্তু আখিরাতে তার জন্য কোন অংশই থাকবে না। (কুরআন, ৪২: ২০)



ধন-সম্পদের ফিতনা বিপর্যস্ত উম্মাহ

শাইখ ইসমাইল হুসাইন আল-মাদানী

গত সংখ্যার পর...

وعن سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنه
- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ « لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَغْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ
جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ »

অর্থ: সাহল ইবনু সা'দ আস-সা'দী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যদি এই দুনিয়ার মূল্য আল্লাহর কাছে সামান্য মাছির ডানা

পরিমাণও হত, তাহলে আল্লাহ তা থেকে কোনো কাফেরকে একফোটা পানিও পান করাতেন না। (সুনানে তিরমিযী: ২৩২০, মুস্তাদরাকে হাকিম: ৭৮৪৭, মিশকাত: ৫১৭৭)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কাফেরদের ভোগবিলাস দেখে মুমিন হয়ত ভাবতে পারে- আমরা আল্লাহর ইবাদাত করছি, অথচ আমাদের এত দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-মুসিবত; আর কাফের

মশার পাখা অর্জনের জন্য কোনো সুস্থ বিবেকবান মানুষ দৌড়ায়? না। তাহলে আমরা এ কোন্ দুনিয়ার পেছনে ছুটছি? প্রতিযোগিতা করছি? আজ সাধারণ থেকে নিয়ে আলেম পর্যন্ত সবার অন্তরেই এ কথা দানা বেধেছে যে, জীবনের জন্য ধন-সম্পদ পানির চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ! এমনকি দীনবিজয়ের জন্যও অনেকে এটাকে শর্ত হিসেবে গণ্য করছেন! যার সামান্য আলোচনা আমরা গত সংখ্যায় পেশ করেছি। এভাবে আমরা সবাই ছুটছি অর্থসম্পদের পেছনে। লিগু হচ্ছি সম্পদ অর্জনের মহা-প্রতিযোগিতায়। এভাবেই পূর্ববর্তীদের মতো আমরাও নিমজ্জিত হচ্ছি ধ্বংসের অতল গহ্বরে।

মহান আল্লাহ বলেন,

أَلْهَأَكُمُ الشُّكْرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَغْلَوْنَ نَحْمُ كَلَّا سَوْفَ تَغْلَوْنَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ
عِلْمَ الْيَقِينِ

অর্থ: পরস্পর ধন-সম্পদের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে। যতক্ষণ না তোমরা উপনীত হও কবরসমূহে। কখনো নয়, শীঘ্রই তোমরা জানবে। কখনো নয়, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। সাবধান! যদি তোমরা নিশ্চিত জ্ঞানে জানতে (তবে এমনটা করতে না)। (কুরআন, ১০২: ১-৫)

সত্যিই! যদি মানুষ আখিরাত সম্পর্কে, জ্ঞানাতের প্রশস্ততা সম্পর্কে দৃঢ় জ্ঞান রাখত তাহলে কস্মিনকালেও সঙ্কীর্ণ, তুচ্ছ এ পৃথিবীর পিছনে ছুটত না। যারা পরকালের মহাশাস্তির কথা ভুলে গিয়ে রবের দেয়া সময় ও শক্তি ব্যয় করে কেবলমাত্র সম্পদের পাহাড় গড়ার পিছে এবং ভাবে- এই টাকা-পয়সাই সব। টাকা ছাড়া জীবনই অচল। তাদের ব্যাপারে মহান রবের সিদ্ধান্ত শুনুন-

الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۖ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ
যে সম্পদ জমা করে এবং বার বার গণনা করে। সে মনে করে তার সম্পদ তাকে অমর করে রাখবে। কখনো নয়, অবশ্যই সে নিক্ষিপ্ত হবে হুতামা জাহান্নামে। (কুরআন, ১০৪: ২-৪)

দেখুন রাসূল কী বলছেন-

عن عمر قال : دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش قد أثر الرمال بجنبه متكئا على وسادة من آدم حشوها ليف . قلت : يا رسول الله : ادع الله فليوسع على أمتك فإن فارس والروم قد وسع عليهم وهم لا يعبدون الله . فقال : " أو في هذا أنت يا ابن الخطاب ؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا " . وفي رواية : " أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة ؟

অর্থ: উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট গেলাম। তিনি তখন খেজুর পাতার চাটাইয়ের উপর শুয়ে ছিলেন। তাঁর ও চাটাইয়ের মাঝে কোনো বিছানা বা চাদর কিছুই ছিল না। ফলে চাটাই তাঁর পিঠে দাগ বসিয়ে দিয়েছিল। আর

০৬/ জানুয়ারি '১৬

তিনি টেক লাগিয়ে ছিলেন খেজুরের আঁশ ভর্তি একটি চামড়ার বালিশের উপর।

তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আল্লাহর কাছে দুআ করুন, যেন তিনি আপনার উম্মতকে সম্বলতা দান করেন। রোম-পারস্যের লোকদের সম্বলতা প্রদান করা হয়েছে। অথচ তারা আল্লাহর ইবাদাত করে না (আমরা আল্লাহর ইবাদাত করছি, তবুও আমাদের এত অভাব-দুর্ভিক্ষ?)। আল্লাহর রাসূল (সা.) বললেন, হে খাতাবের বেটা! তুমি কি এখনও এ ধারণা পোষণ করছ? আরে তারা তো এমন সম্প্রদায়, যাদেরকে দুনিয়ার জীবনেই (প্রতিদান) দিয়ে দেয়া হচ্ছে। তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তারা দুনিয়া প্রাপ্ত হোক, আর আমাদের জন্য আখেরাত থাকুক? (বুখারী ও মুসলিম সূত্রে মিশকাত, বাব- ফায়লিল ফুকারা ওমা কানা মিন আইশিন নাবিয়া, হাদীস: ৫২৪০)

সত্যিই! যদি মানুষ আখিরাত সম্পর্কে, জ্ঞানাতের প্রশস্ততা সম্পর্কে দৃঢ় জ্ঞান রাখত তাহলে কস্মিনকালেও সঙ্কীর্ণ, তুচ্ছ এ পৃথিবীর পিছনে ছুটত না।

যারা পরকালের মহাশাস্তির কথা ভুলে গিয়ে রবের দেয়া সময় ও শক্তি ব্যয় করে কেবলমাত্র সম্পদের পাহাড় গড়ার পিছে এবং ভাবে- এই টাকা-পয়সাই সব। টাকা ছাড়া জীবনই অচল।

আরও স্পষ্ট করে দিবে নিচের হাদীসটি-

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لحاجث الجنة والثائر فقال الثائر أو رثك بالشكرين والشكرين وقالت الجنة ما لي لا أدخلني إلا طعفاء الناس وسقطهم قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحيبي أرعيتك من أشاء من عبادي وقال للثائر إنما أنت غداي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحد منهما ملأها فأما الثائر فلا تغش على نفع رجلة فتقول قط قط فهايك تغش على وراوى نفعها إلى نفسي ولا تغش الله عز وجل من خلقه أخذا وأما الجنة فإن الله عز وجل ينشئ لها خلدا

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেছেন, একদা জ্ঞানাত-জাহান্নাম উভয়ে বিতর্কে লিপ্ত হলো। জাহান্নাম বলল, আমার ভিতরে থাকবে অহঙ্কারী ও স্বৈরাচারীরা। জ্ঞানাত বলল, আমার কোন চিন্তা নেই। আমার ভিতরে প্রবেশ করবে দুর্বল, অবহেলিত ও দরিদ্র লোকেরা। তখন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা জ্ঞানাতকে বললেন, হে জ্ঞানাত! তুমি আমার দয়া তোমার মাধ্যমে আমি যাকে ইচ্ছা, দয়া করব।

জাহান্নামকে বললেন, হে জাহান্নাম! তুমি আমার আযাব। তোমার মাধ্যমে যাকে ইচ্ছা, আমি আযাব দিব। আর তোমাদের উভয়কে পরিপূর্ণ করা আমারই দায়িত্ব। তো জাহান্নাম সেখানে আল্লাহর পা রাখার পূর্ব পর্যন্ত পূর্ণ হবে না। আল্লাহ পা রাখলে জাহান্নাম বলবে, যথেষ্ট! যথেষ্ট! অতঃপর তা পূর্ণ হয়ে যাবে। এরপর জাহান্নামের এক প্রান্তের সাথে আরেক প্রান্তকে কুঞ্চিত করে দেয়া হবে। আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির কারো প্রতি অবিচার করবেন না। অন্যদিকে জ্ঞানাত পূর্ণ করার জন্য অন্য একটি জাতি সৃষ্টি করবেন। (বুখারী: ৪৮৫০, মুসলিম: ৭৩৫৪, আহমাদ: ৮১৬৪, ইবনে হিব্বান: ৭৪৪৭, কানযুল উম্মাল: ৩৯৫৬২, মিশকাত: ৫৬৯)

মুজাহিদ হওয়া কি
 'আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ'
 নাকি যে, একদিন ঘুমালেন
 আর সকালে উঠে দেখলেন
 আপনি একজন পরিপূর্ণ
 মুজাহিদ হয়ে গেছেন?
 আপনি অপেক্ষায় আছেন
 কবে ডাক আসবে, আর
 ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে
 জীবন বিলিয়ে দেবেন? এই
 মানসিকতার অধিকারী কত
 ভাই আজ আযমতের
 জিহাদ তো দূরের কথা
 রুখসতের দীনটুকু পর্যন্ত
 পরিত্যাগ করেছে। এ কথা
 বলা যায় না যে, তাদের
 নিয়তে কোনো গরমিল
 ছিল। কিন্তু যখন আল্লাহর
 পক্ষ হতে জামাআহর উপর
 পরীক্ষা আসলো তখন
 তাদের পক্ষে সবর করা বা
 অটল থাকা সম্ভব হয়নি।
 কীভাবে হবে? তাদের
 মুজাহিদ হওয়ার স্বপ্নটাতো
 ছিল স্রেফ আবেগতাজিত।
 তারাও স্বপ্ন দেখত— একটা
 বুলেটের।

জিহাদি নয় মুজাহিদ হোন...

বর্তমানে বহুল ব্যবহৃত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে প্রচুর তরুণ ও যুবককে জিহাদের কথা বলতে দেখা যায়।
 মাযলুমানের পক্ষে যালিম কাফিরদের বিরুদ্ধে আক্রোশ কিংবা মুসলিম সমাজে ইসলামের পুনঃ প্রতিষ্ঠা অথবা দীনবিজয়ের লক্ষ্যে মনে জিহাদের অনুভূতি সৃষ্টি হওয়া নিশ্চয় ঈমানের পরিচায়ক। কিন্তু সমস্যা হলো, এ ধরনের যুবকদের অনেকেই নফল ও সুন্নাহ সালাতসমূহ আদায়, সুন্নাহসম্মত যিকির-আয্কার, মাসনুন দুআ, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর প্রতি নিয়মিত দরুদ পাঠ, কুরআন তিলাওয়াত, হাদীস চর্চা, বড়দের জীবনী অধ্যয়ন ইত্যাদির উপর মোটেই গুরুত্ব দেয় না। অনেক সময় তারা ফালতু বিষয়ে আড্ডা দিয়ে সময় নষ্ট করে। ধৈর্যের গুণ চর্চা করে না। রাগ হজম করতে পারে না। অল্পতে রেগে যায়। সহনশীলতার লেশমাত্রও নেই তার মাঝে। আবার অনেকে মিথ্যা, গীবত ও ঘিনা করতেও পরোয়া করে না। লেনদেন ঠিক রাখে না। অভিভাবকের ভরণ-পোষণের উপর নির্ভরশীল এ ধরনের চরিত্রের যুবকেরা যখন জিহাদের কথা বলে, তখন সেটি আবেগ কিংবা হিরোইজম (সমাজে নিজেকে 'হিরো' প্রমাণের চেষ্টা) তাজিত বিষয় বলে মনে হয়।
 লক্ষ্য করুন হাদীসদ্বয়—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حَتَيْنَا فَقَالَ لِرَجُلٍ مِّنْ يُّدْعَى بِالإِسْلَامِ « هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ » فَلَمَّا حَضَرْنَا الْقِتَالَ قَاتَلَ الرَّجُلُ قِتَالًا شَدِيدًا فَأَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ الَّذِي قُلْتَ لَهُ إِنْفًا « إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ » فَإِنَّهُ قَاتَلَ الْيَوْمَ قِتَالًا شَدِيدًا وَقَدْ مَاتَ. فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « إِلَى النَّارِ » فَكَادَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَرْتَابَ فَبَيَّنَّا لَهُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذْ قِيلَ إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ وَلَكِنَّ بِهِ

মাযলুমানেৰ পক্ষে যালিম
কাফিৰদেৰ বিৰুদ্ধে
আক্ৰোশ কিংবা মুসলিম
সমাজে ইসলামেৰ পুনঃ
প্ৰতিষ্ঠা অথবা দীনবিজয়েৰ
লক্ষ্যে মনে জিহাদেৰ
অনুভূতি সৃষ্টি হওয়া নিশ্চয়
ঈমানেৰ পৰিচায়ক। কিন্তু
সমস্যা হলো, এ ধৰনেৰ
যুবকদেৰ অনেকেই নফল ও
সুনত সালাতসমূহ আদায়,
সুনাহসম্মত
যিকিৰ-আয্কাৰ, মাসনুন
দুআ, রাসূলুল্লাহ (সা.) এৰ
প্ৰতি নিয়মিত দৰুদ পাঠ,
কুৰআন তিলাওয়াত, হাদীস
চৰ্চা, বড়দেৰ জীবনী
অধ্যয়ন ইত্যাদিৰ উপৰ
মোটেই গুৰুত্ব দেয় না।
অনেক সময় তাৰা ফালতু
বিষয়ে আড্ডা দিয়ে সময়
নষ্ট কৰে। ধৈৰ্যেৰ গুণ চৰ্চা
কৰে না। রাগ হজম কৰতে
পারে না। অল্লতে রেগে
যায়। সহনশীলতাৰ
লেশমাত্রও নেই তাৰ
মাঝে। আবার অনেকে
মিথ্যা, গীবত ও যিনা
কৰতেও পৰোয়া কৰে না।
লেনদেন ঠিক রাখে না।
অভিভাবকেৰ
ভরণ-পোষণেৰ উপৰ
নিৰ্ভৰশীল এ ধৰনেৰ
চৰিত্ৰেৰ যুবকেৰা যখন
জিহাদেৰ কথা বলে, তখন
সেটি আবেগ কিংবা
হিরোইজম (সমাজে
নিজেকে 'হিরো' প্ৰমাণেৰ
চেষ্টা) তাড়িত বিষয় বলে
মনে হয়।

جَزَاحًا شَدِيدًا فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَضْبِرْ
عَلَى الْجَزَاحِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَقَالَ «اللَّهُ أَكْبَرُ
أَشْهَدُ أَنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ». ثُمَّ أَمَرَ بِبَلَاءِ
نَفْسٍ فِي النَّاسِ «إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا
بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ»

আবু হুৰাইৰা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি
বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর
সাথে হুনাইনেৰ যুদ্ধে অংশগ্রহণ
কৰেছিলাম। এতে তিনি মুসলিম
হওয়ার দাবিদার এক লোকেৰ ব্যাপারে
বললেন, “এ লোকটি জাহান্নামী।”
অতঃপর যখন যুদ্ধ হলো, তখন লোকটি
প্ৰবল বীরত্বেৰ সাথে যুদ্ধ কৰল এবং
আহত হলো। রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে
জানানো হলো যে, আপনি যে লোককে
জাহান্নামী বলেছেন, সেতো আজ প্ৰবল
বীরত্বেৰ সাথে লড়াই কৰেছে এবং
শহীদ হয়েছে। তিনি বললেন, “সে
জাহান্নামে গেছে।” এ কথায় কেউ
কেউ সন্দিহান হয়ে পড়ল (অৰ্থাৎ, তাৰ
জাহান্নামী হওয়ার কথায় বিশ্বাস স্থাপন
কৰতে পাৰছিল না)। এ অবস্থায় হঠাৎ
বলা হলো যে, লোকটি মারা যায়নি।
বরং সে প্ৰচণ্ডভাবে আহত হয়েছিল
এবং ব্যথায় ধৈৰ্যধাৰণ কৰতে না পেরে
ৰাতে সে আত্মহত্যা কৰেছিল।
অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কাছে এ
খবৰ পৌঁছানো হলে তিনি বললেন,
“আল্লাহ সবচেয়ে মহান। আমি সাক্ষ্য
দিচ্ছি যে, আমি আল্লাহৰ বান্দা ও
রাসূল।” এরপর তিনি বেলাল
(রা.)-কে মানুষেৰ মাঝে এ কথা
ঘোষণা কৰে দেওয়ার জন্য আদেশ
দেন যে, “মুসলিম ব্যতীত আর কেউ
জান্নাতে প্ৰবেশ কৰবে না এবং আল্লাহ
ফাজিৰ (কাফিৰ) লোক দ্বাৰাও এ
দীনকে সাহায্য কৰেন। (বুখাৰি:
৩০৬২, মুসলিম: ৩১৯, আহমাদ:
৮০৯০, মিশকাত: ৫৮৯২)

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ:
الْعَزُوفُ غَرْوَانٍ. فَأَمَّا مَنْ ابْتَغَى وَجْهَ اللَّهِ،
وَأَطَاعَ الْإِمَامَ، وَأَتَّقَى الْكَرِيمَةَ، وَيَأْتَرَ
الشَّرِيكَ، وَاجْتَنَبَ الْفُسَادَ، فَإِنَّ ثَوْمَهُ وَنَبْهَهُ
أَجْرٌ كُلُّهُ، وَأَمَّا مَنْ غَرَا خُزًّا وَرِيَاءً وَسُغْفَةً
وَعَصَى الْإِمَامَ، وَأَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ فَإِنَّهُ لَنْ يَرْجِعَ

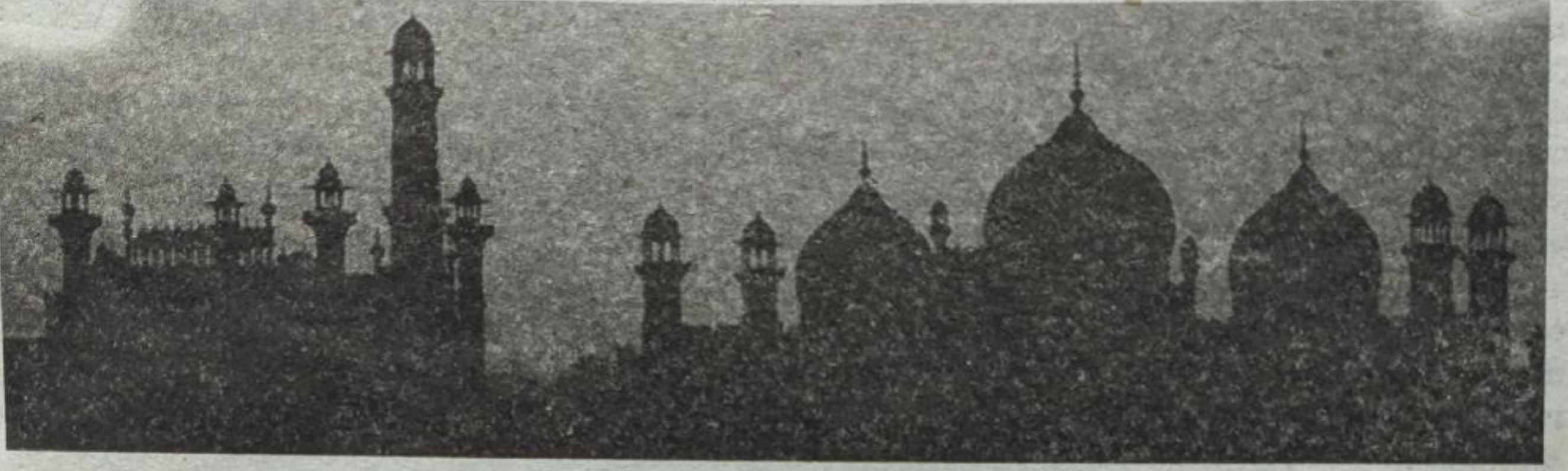
بِالْكَفَافِ

মুয়ায বিন জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত।
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যোদ্ধা দুই
ধৰনেৰ। ১. যে আল্লাহৰ সন্তুষ্টি তালাশ
কৰেছে, আমীৰেৰ কথা মান্য কৰেছে,
প্ৰিয় বস্তু ব্যয় কৰেছে, সহকৰ্মীৰ সাথে
সহজ আচৰণ কৰেছে এবং বিশৃঙ্খলা
থেকে আত্মৰক্ষা কৰেছে। এরকম হলে
তাৰ ঘুম ও জাগ্ৰতবস্থা উভয়ই
প্ৰতিদানযোগ্য হবে। ২. অন্যদিকে যে
গৌৰব, লোক দেখানো ও সুনামেৰ
আশায় যুদ্ধ কৰেছে, আমীৰেৰ অবাধ্য
হয়েছে এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি কৰেছে, সে
কোনো প্ৰতিদান নিয়ে ফিৰতে পাবেনি।
(মুয়াত্তা মালিক: ১৬৯৩, আবু দাউদ:
২৫১৭, মুসনাদে আহমাদ: ২২০৪২,
দারিমী: ২৪৭২)

মুজাহিদ হওয়া কি ‘আলাদিনেৰ আশ্চৰ্য
প্ৰদীপ’ নাকি যে, একদিন ঘুমালেৰ আর
সকালে উঠে দেখলেন আপনি একজন
পৰিপূৰ্ণ মুজাহিদ হয়ে গেছেন? আপনি
অপেক্ষায় আছেন কবে ডাক আসবে,
আর ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে জীবন
বিলিয়ে দেবেন? এই মানসিকতাৰ
অধিকাৰী কত ভাই আজ আযমতেৰ
জিহাদ তো দূৰেৰ কথা রুখসতেৰ
দীনটুকু পৰ্যন্ত পৰিত্যাগ কৰেছে। এ
কথা বলা যায় না যে, তাৰেৰ নিয়তে
কোনো গৰমিল ছিল। কিন্তু যখন
আল্লাহৰ পক্ষ হতে জামাআহৰ উপৰ
পৰীক্ষা আসলো তখন তাৰেৰ পক্ষে
সবৰ কৰা বা অটল থাকা সম্ভব হয়নি।
কীভাবে হবে? তাৰেৰ মুজাহিদ হওয়ার
স্বপ্নটাতো ছিল স্ৰেফ আবেগতাড়িত।
তাৰাও স্বপ্ন দেখত— একটা বুলেটেৰ।
যা বুকে বিদ্ধ হয়ে ঠেকবে পিঠে গিয়ে।
স্বপ্ন দেখত— শহীদ হওয়ার। জান্নাতে
সবুজ পাখিৰ বেশে নিৰ্বিয়ে ঘুরে
বেড়াব। কিন্তু আজ তাৰেৰ চোখেৰ
সামনেই সে স্বপ্ন ধূলোয় গড়াগড়ি
খাচ্ছে। ক্ষোভে আক্ৰোশে চিৎকাৰ কৰে
বলছে, ‘কেন দেখেছিলি দীনবিজয়েৰ
স্বপ্ন, এভাবেই ফিৰে যাবি যদি?
ধূলোমলিন হোক তোৰ মুখ!’

আল্লাহ আমাদেরকে আবেগতাড়িত
জিহাদি না বানিয়ে দীনেৰ পথে প্ৰকৃত
ত্যাগী মুজাহিদ হবার তাওফিক দান
করুন। আমীন।

শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম (রহ.) এর উপদেশ



উমার ইবনু আদির রহমান

অসন্তুষ্টি প্রকাশ না করে পরামর্শ দিন

আব্বাহর নবী তাদের কথা আমাদের কাছে বলে গেছেন, যারা মুখোমুখি প্রশংসা করে। তিনি বলেছেন, তাদের মুখে ধূলা নিক্ষেপ করো যারা কোনো ব্যক্তির সামনে ওই ব্যক্তির প্রশংসা করে।

তিনি আরও বলেন, যখন তুমি সামনাসামনি তোমার ভাইয়ের প্রশংসা করলে মানে তুমি তার মেরুদণ্ড ভেঙে দিলে।

এটা শুধু সেক্ষেত্রেই করা যেতে পারে, যখন তুমি তার ভুলগুলো শোধরে দিতে চাও। এক্ষেত্রে তার কিছু ভাল গুণ আগেই উল্লেখ করাতে দোষের কিছু নেই। যেমন তাকে বলা, ভাই তুমি অত্যন্ত বুদ্ধিমান। মানুষরা তোমায় পছন্দ করে এবং তোমাকে নেতা হিসেবে মানে। কিন্তু আমি তোমার কিছু দোষ লক্ষ্য করেছি। তোমার পক্ষে কি এগুলো শোধরে নেয়া সম্ভব হবে? যদি সেই ব্যক্তির কর্তৃত্ব তোমার উপর থাকে, তোমার সিনিয়র অথবা তোমার মাতাপিতা হোন সেক্ষেত্রে তাদেরকে চিঠি (বা মেসেজ) পাঠাতে পার। যেমন- হাসান আল-বান্না (রহ.) বলেন,

“আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ এই নীতিতে। আমাদের একজন শাইখ ছিলেন যিনি আমাদের আমাদের পড়াতেন এবং দেখাশোনা করতেন। একদিন আমি তাকে মসজিদের দুই পিলারের মধ্যবর্তী স্থানে সালাত আদায় করতে দেখলাম। তাই আমি তাকে বলতে চাইছিলাম যে, পিলারের মধ্যে নামায পড়া মাকরুহ। অতঃপর আমি একটি চিঠি লিখি এবং প্রেরক হিসেবে দিলাম “একজন উত্তম উপদেশদাতা”। লিখলাম, ‘হে শাইখ! আমি আপনাকে দেখেছি মসজিদের পিলারের মাঝে আপনি নামায পড়েন কিন্তু আব্বাহর রাসূল (সা.) তা অপছন্দ করতেন।’ আমি সেটা ডাক বিভাগের মাধ্যমে পাঠিয়েছিলাম। তিনি চিঠি পড়ে উত্তর দিলেন, ‘হে যুবকেরা আমি এক ব্যক্তির চিঠি পেয়েছি যে কিনা আমাকে দুই পিলারের মাঝে নামায না পড়তে উপদেশ দিয়েছে এবং আমার তা আগে জানা ছিল না যে, পিলারের মধ্যে নামায পড়া মাকরুহ, তোমরা কেউ এটা করো না।’

হাসানুল বান্না আরও বলেন, “আমি সেই যুবকদের মধ্যে থেকে ছিলাম যাদের সামনে উনি কথাগুলো

বলেছিলেন। সুতরাং আমরা আমাদের শিক্ষককে কোনো অপমান না করেই ভাল একটা কাজ করে ফেললাম।”

অতএব সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ দেয়া ব্যক্তির জন্য আবশ্যক— সে যেন মানুষদের ভালবাসে, সে যেন দূরদর্শি হয়, যেন সে জিহ্বা সংযত রাখতে পারে। কারো কাছে গিয়ে এরূপ বলো না যে, “আপনাকে আমি আল্লাহর জন্য ঘৃণা করি। কারণ আপনি এই এই কাজ করেছেন।” এর পরিবর্তে, আপনি কি এভাবে বলতে পারেন না “আমি আপনাকে আল্লাহর জন্য ভালবাসি, আমার ভাই! যদিও আমি আপনার মাঝে সাধারণ এবং ছোট একটি ভুল দেখেছি।”

এক ভাই আমাকে নিচের ঘটনাটি বর্ণনা করেছেনঃ

একজন আমার কাছে এসে বলল, ‘আমি তোমাকে আল্লাহর জন্য ঘৃণা করি।’

আমি বললাম, ‘কেন? কেন তুমি আমাকে ঘৃণা কর?’

সে জবাবে বলল, ‘কারণ তোমার বাবা ইখওয়ানুল মুসলিমীনের সদস্য।’

লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। ইসলাম কি তাই? আমি তাকে ঘৃণা করি আল্লাহর জন্য— কিন্তু কেন? কারণ তার বাবা ইখওয়ানুল মুসলিমীনের সদস্য! আমাদের সম্পর্কের ব্যাপারে আল্লাহই যথেষ্ট। এই ব্যক্তি মনে করল যে, সে ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজের নিষেধ করেছে এবং সে সত্যের ঘোষণা দিয়েছে। সে চিন্তা করল যে, সে পুরস্কৃত হবে, যে সিদ্ধান্ত একজন মুসলিমের উপর সে চাপিয়ে দিয়েছে তাঁর কারণে। মাআযাল্লাহ।

[সূত্র: ফী যিলাল সূরা তাওবা]

আল-কুরআন

এটি আপনার উপর দায়িত্ব যে, আপনি কুরআনের প্রতি যত্নবান হবেন। যা আপনার হৃদয়ের স্পন্দন, অন্তরের আলো ও হতাশা দূরকারী। আর এখনই হলো কুরআন মুখস্থ করার সময়। আমি এটি শুরু করে খুবই

অতএব সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ দেয়া ব্যক্তির জন্য

আবশ্যক— সে যেন

মানুষদের ভালবাসে, সে

যেন দূরদর্শি হয়, যেন সে

জিহ্বা সংযত রাখতে

পারে। কারো কাছে গিয়ে

এরূপ বলো না যে,

“আপনাকে আমি আল্লাহর

জন্য ঘৃণা করি। কারণ

আপনি এই এই কাজ

করেছেন।” এর পরিবর্তে,

আপনি কি এভাবে বলতে

পারেন না “আমি

আপনাকে আল্লাহর জন্য

ভালবাসি, আমার ভাই!

যদিও আমি আপনার মাঝে

সাধারণ এবং ছোট একটি

ভুল দেখেছি।”

উপকৃত হয়েছিলাম ১৯৬৬ সালে (ফিলিস্তিনের যুদ্ধের সময়) প্রশিক্ষণের দিনগুলো থেকে। আমি খুবই উত্তম ফলাফল পেয়েছিলাম কুরআন মুখস্থ করে এবং সেই সময়টা ছিলো আমার হৃদয় ও অন্তঃকরণ বিকল্পকরণের সোনালী সময়। তাই এখানে (রণাঙ্গনে) এটা আপনার জন্য মুখস্থ করা সহজ; খুবই সহজ, হ্যাঁ। আমার কাছে বড় ছাপার একটি কুরআনের কপি ছিল। আর যখন আমি রাতে পাহারা দিতাম তখন যা দিনে মুখস্থ করতাম তা পুনরায় তিলাওয়াত করতাম। যদি আমি কোথাও ভুল করতাম তখনই তা খুলে দেখতাম এবং চাঁদের আলোতে তা পড়তাম। আর এখন, আমি দিনের আলোতেও ভালভাবে দেখি না, সুতরাং আমরা আল্লাহর কাছে আমাদের চোখের জ্যোতি বৃদ্ধির জন্য দুআ করি

তাই চেষ্টা করুন দৈনিক পাঁচটি আয়াত মুখস্থ করতে। শুরু করুন সূরা আনফাল দিয়ে। প্রতিদিন সকালে

ফজরের পর বসে পড়ুন কুরআন নিয়ে, মুখস্থ করুন সূরা আনফালের পাঁচটি করে আয়াত এবং পুনরাবৃত্তি করুন আগের দিনের পাঁচটি আয়াত। আপনি মুখস্থ করতে পারবেন ১৫ দিনে ৭৫টি আয়াত, ৫টি আয়াত প্রতিদিন, এটা আপনার জন্য খুবই সহজ।

আমাদের ভাই, খালিদ কালবান। যে শহীদ হয়েছে দুদিন আগে। রিয়াদের আবু আল-ওয়ালিদ, শহীদ হয়েছে জুমাবার দুপুর ২-৩০ মিনিটে। আমি তার ভাইয়ের কাছে গিয়েছিলাম। তখনও আমি তার শহীদ হওয়ার কথা জানতাম না। তার সঙ্গী-সাথীরা তার সম্পর্কে বলল যে, তাঁর প্রতিটি কাজই ছিল আখিরাতমুখী। মধ্যরাত হতে রাত ১টা পর্যন্ত পাহারা দিত। অতঃপর সে নামাযে থাকত ফজর পর্যন্ত। সকালে ফজরের আযান দিত এবং নামায পড়ত। তারপর সে যিকির করত। সে সোম ও বৃহস্পতিবার নিয়মিত সিয়াম পালন করত এবং প্রতি আরবি মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখও। এমনকি শাওয়ালের ৬ দিনও সে সিয়াম পালন করত। তারা আরও বলল, শুক্রবার রাতে অর্থাৎ তার জীবনের শেষ রাতে— সে রাত ১টা পর্যন্ত পাহারায় কাটাল। তারপর তাহাজ্জুদ নামায পড়ল ফজর পর্যন্ত। সে নিজে ফজরের আযান দিলো এবং নামায পড়ল। তারপর সকালের মাসনুন যিকির করল। তারপর আমরা ঐ দিনের জন্য নির্ধারিত যুদ্ধক্ষেত্রে রওয়ানা করলাম। পথিমধ্যে সে সূরা কাহাফ তিলাওয়াত করল এবং দুআয় বেশি করে রাসূল (সা.) এর উপর দরুদ পড়ল। যখন আমরা পৌছলাম, তার ইয়েমেনের সাথী বলল, তোমার কি সূরা কাহাফ তিলাওয়াত করা শেষ? সে বলল, ‘হ্যাঁ।’ তারপর আমরা মর্টার বর্ষণ শুরু করি এবং মর্টারের ১৯তম শেলটি ভিতরেই বিস্ফোরিত হয় আর শেলের বেশকিছু টুকরো তার শরীরে ঢুকে পড়ে। এরপর সে মাত্র দু’বার খিচুনি দেয়। তার রুহ মহাবিশ্বের রবের সাথে মিলিত হয়।

[ফী আত-তারবিয়া আল-জিহাদিয়া ওয়াল বিনা, ২/৪০-৪২ পৃঃ]

মুসলিম কারাবন্দিদের পক্ষে কে দাঁড়াবে?

শাইখ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ আল-হাবদান



গত সংখ্যার পর
হে বন্দি ভাই আমার! জেনে রেখো
তুমি, তোমার অপমান তো শুধু লোহার
শিকল আর ইটের দালানে নয়! তোমার
সবচেয়ে বড় অপমানের কারণ আমরা।
যাদেরকে পিছনে ফেলে আজ তুমি এই
কারাগারে এসেছ। তুমি তো সাহায্য
করেছ সেই দীনকে যা এসেছে
অদৃশ্যের জ্ঞানী থেকে। আর মর্যাদা?
অবশ্যই তুমি তা অর্জন করেছ।
অন্তরের অন্ত:স্থল থেকে আমি জানি,
তুমিই সম্মানিত। আমাদের
কারাবন্দিরা, আমরা তোমাদের ভুলে
গেছি। না, আসলে আমরা তোমাদের
পরিত্যাগ করেছি! আমরা ঘুমিয়ে

আছি। এমনকি সিংহের গর্জনেও
আমাদের এই ঘুম ভাঙ্গবে না। এই
দুনিয়া কতকাল ধরে ঘুমিয়ে আছে আজ
আর এই লোকেরা, ক্রুশের পূজারীরা,
যেন তারাই আছে সত্য পথের উপরে।
এই দৃশ্য দেখার থেকে কষ্টের আর কী
হতে পারে? হে মুসলিম উম্মাহ!
নিশ্চিতভাবেই আমাদের সালফে
সালেহীনগণ আমাদের জন্যে উদাহরণ
ও অনুসরণীয় নীতি রেখে গেছেন।
রেখে গেছেন কিভাবে শত্রুদের হাত
থেকে মুসলিম বন্দিদের মুক্ত করতে হয়
তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।
যখন মানসুর বিন আবি আমির উত্তর
আন্দালুসিয়ার জিহাদ থেকে ফিরে

আসলেন, তিনি কর্ডোভার একটি
ফটকে একজন মুসলিম নারীর সাক্ষাত
লাভ করলেন। মহিলাটি তাকে
বললেন, আমি নিশ্চিত আমার সন্তানকে
খৃস্টানরা বন্দি হিসেবে ধরে নিয়ে
গেছে। আর তুমি মুক্তিপণ দিয়ে তাকে
মুক্ত করে আনো। মানসুর শহরের
ফটক থেকেই ফিরে গেলেন,
কর্ডোভাতে প্রবেশ পর্যন্ত করলেন না।
বরং তিনি মুজাহিদ্দীনদের সাথে করে
ফিরে গেলেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না
তাকে মুক্ত করে আনতে পারলেন
ততক্ষণ পর্যন্ত ফিরে এলেন না, আর এ
সবই মাত্র একজন মুসলিম বন্দিকে মুক্ত
করে আনার জন্যে।

আর স্মরণ করুন
আন্দালুসিয়ার সেই শাসকের
কথা। যার নাম হাকাম বিন
হিশাম। যখন জানলেন
একজন মুসলিম নারীকে বন্দি
হিসেবে তুলে নেয়া হয়েছে।
তিনি শুনলেন, ও হাকাম!
আমাকে উদ্ধার করো।
ঘটনাটির গুরুত্ব তাকে
ভারাক্রান্ত করে ফেলল।
কাজেই তিনি লোকজন জড়ো
করলেন, নিজে এবং তার
সৈন্যদল প্রস্তুত করলেন এবং
১৯৬ হিজরিতে শত্রুদের
উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলেন।
তিনি তাদের দেশে নিজের
বাহিনী চালিয়ে দিলেন।
একের পর এক দুর্গ জয়

করলেন। তিনি সারা দেশ তখনই করে
দিলেন। সমস্ত সম্পদ আটক করলেন।
যুদ্ধে শত্রুপক্ষের পুরুষেরা নিহত হলো,
নারীরা যুদ্ধবন্দি হলো। আর এসব কী
জন্যে? একজন মুসলিম নারীর সম্মান
রক্ষার্থে। তার মুক্তি নিশ্চিত করার
পরেই তিনি বিজয়ীর বেশে ফিরে
এলেন কর্ডোভাতে।

মু'তাসিমের নিকট এই মর্মে আরো
সংবাদ পৌঁছলো যে, উমুরিইয়াহ নামক
স্থানে একজন খৃস্টান ব্রুট (Brute)
কর্তৃক একজন মুসলিম বোনকে বন্দি
করা হয়েছে। আরো সংবাদ এলো,
তাকে বন্দি করে নির্যাতন করা হচ্ছিল
এবং গালে থাপ্পড় মারা হচ্ছিল।
একজন গুপ্তচর খলিফা মু'তাসিমের

নিকট জানাল যে, নির্যাতনের সময় মহিলাটি ওহে মু'তাসিম! বলে ডাকছিল এবং কীভাবে একজন খলিফা বর্তমান থাকাবস্থায় শত্রুদের হাতে মুসলমান নারী নির্যাতনের শিকার হয় তা নিয়ে আক্রোশ করছিল। এ ঘটনা শুনে খলিফা মু'তাসিম যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হলেন, প্রমাণ করে দিলেন- একজন মাত্র একজন মুসলমানের মর্যাদা কত বেশি, যাকে মুক্ত করার জন্যে তিনি নিজে সেনাদলের প্রধান হিসেবে সত্তর হাজার সৈন্যের বাহিনী নিয়ে উমুরিয়াহ নামক স্থানে পৌঁছলেন এবং তা জয় করলেন, এরপর সেই বিধর্মী অত্যাচারী খৃস্টানকে খুঁজে বের করলেন। তার শিরোচ্ছেদ করলেন এবং সেই সম্ভ্রান্ত মুসলিমাকে মুক্ত করে একজন যথাযথ শাসকের দায়িত্ব পালন করলেন।

আবু গালিব হাম্মাম বিন আল মুহাযিব আল মা'রি তার ইতিহাসগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন- সাইফ আদ-দৌলা তার সমস্ত কোষাগার খালি করে অর্থ খরচ করেছেন রোমানদের হাত থেকে মুসলিম বন্দিদের মুক্তিপণ হিসেবে। আরো উল্লেখ করেছেন আবুল আব্বাস আল খুযাই, শাম দেশের যিনি গভর্নর ছিলেন- তিনি তুর্কিদের থেকে মুসলিম বন্দিদের মুক্ত করার জন্যে সেই আমলে এক মিলিয়ন দিরহাম পর্যন্ত ব্যয় করেছেন।

এই ছিল সেই সব মুসলিম দেশের শাসকেরা যারা গত হয়েছেন, যখনই তারা কোন সাহায্যের আর্তচিৎকার শুনেছেন, তারা তীরের মত সেখানে সাড়া দিতে ছুটে গেছেন, সাহায্য করেছেন এবং ময়লুমকে যালিমের হাত থেকে মুক্ত করেছেন। আর হ্যাঁ, এজন্যেই খলিফা উমর বিন আবদুল আযীয (রহ.) এর মতো মহান ব্যক্তির তঁর মন্ত্রীকে এই মর্মে পত্র লিখে পাঠিয়েছিলেন,

যদি একজন মাত্র মুসলিম কারাবন্দিকে মুক্ত করার জন্যে সমগ্র ইসলামি রাষ্ট্রের কোষাগার খালি করে দিতে হয় তবে তাই করো।

যদি অর্থের বিনিময়ে বন্দিদের মুক্ত করা না যায়, তাহলে চূড়ান্ত সতর্কতা এবং মৌখিক হুমকির ব্যবহার করা আবশ্যিক।

ইবনে তাইমিয়া
সাইপ্রাসের সম্রাটের নিকট
নিম্নলিখিত পত্রটি প্রেরণ
করেন-

হে সম্রাট! এটা কেমন
কাজ হলো, তুমি
রক্তপাতের অনুমতি দিচ্ছ,
মহিলাদের বন্দি হিসেবে
ধরে নিয়ে যাচ্ছ, মানুষের
সম্পদ দখল করছ অথচ
তুমি কিনা আল্লাহ এবং
তঁর রাসূলের পক্ষ হতে
কোন অনুমতি বা বৈধতা
দিলে না? আমরা কি ধরে
নিব যে, সম্রাট জানে না
এই আমাদের দেশে
অগণিত খৃস্টানেরা শান্তি
এবং নিরাপত্তার সাথে বাস
করে আসছে?

যখন কুতাইবা (রহ.) সুমানের শাসকের সাথে বন্দিদের ব্যাপারে আলোচনা করছিলেন, তখন তিনি নাইজাক টারখানের নিকট মুসলিম বন্দিদের ব্যাপারে চরমপত্র প্রেরণ করেছিলেন এবং এর ভাষা ও হুমকির ধরণ দেখে শাসক নাইজাক ভীত হয়ে তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গিয়েছিল এবং মুসলিম কারাবন্দিদের মুক্ত করে দিয়েছিল।

জনসাধারণের মাঝে মুসলিম যুদ্ধবন্দি ও কারাবন্দিদের মুক্ত করার ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টিতে আলেমগণ সর্বদাই সচেষ্ট ভূমিকা পালন করেছেন। এটা তারা করেছেন নিজেদের দেশের মুসলিম শাসকের নিকট চরমপত্র প্রেরণ করে কিংবা শত্রুদেশের শাসকের সাথে সাক্ষাত করে কিংবা কমপক্ষে তঁরা আল্লাহর দরবারে দুআ করে হলেও চেষ্টা করেছেন যেন মুসলিম

যুদ্ধবন্দিদের মুক্ত করে দেয়া হয়। আমরা জানি, ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বুলাই-এর সাথে সাক্ষাতের জন্যে গিয়েছিলেন, সে ছিল একজন মঙ্গোলীয় জেনারেল এবং ইবনে তাইমিয়ার দাবির প্রেক্ষিতে সে সময় মঙ্গোলদের হাত থেকে অনেক মুসলিম যুদ্ধবন্দিদের মুক্ত করা সম্ভবপর হয়েছিল।

ইবনে তাইমিয়া সাইপ্রাসের সম্রাটের নিকট নিম্নলিখিত পত্রটি প্রেরণ করেন-
হে সম্রাট! এটা কেমন কাজ হলো, তুমি রক্তপাতের অনুমতি দিচ্ছ, মহিলাদের বন্দি হিসেবে ধরে নিয়ে যাচ্ছ, মানুষের সম্পদ দখল করছ অথচ তুমি কিনা আল্লাহ এবং তঁর রাসূলের পক্ষ হতে কোন অনুমতি বা বৈধতা দিলে না? আমরা কি ধরে নিব যে, সম্রাট জানে না এই আমাদের দেশে অগণিত খৃস্টানেরা শান্তি এবং নিরাপত্তার সাথে বাস করে আসছে? তাদের সাথে আমাদের আচরণের স্বরূপ সবাই জানে। তাহলে এটা কেমন ঘটনা হলো, তুমি আমাদের বন্দিদের সাথে এমন আচরণ করছ যে, একজন নীতিবোধ সম্পন্ন মানুষ, বিবেকবান মানুষ কিংবা একজন ধার্মিক লোকও কিছুতেই সম্মত হতে পারছে না!

বরং অনেকের প্রতিই অত্যাচার নির্যাতন চালানো হচ্ছে বন্দি অবস্থায়, অথচ বন্দিদের নির্যাতন সকল ধর্মে, আইনে, রাজনীতিতে নিষিদ্ধ। কীভাবে তুমি সেই সকল লোকদের আটক করে রেখেছ যাদের নির্যাতন করার জন্যে বন্দি হিসেবে তুমি ধরে নিয়ে গেছ? কেবল অত্যাচার চালানোর জন্যে? তুমি কি মনে করেছ তুমি এতকিছুর পরেও নিরাপদে থাকবে? এতকিছুর পরে যখন তুমি মুসলিমদের মুখোমুখি হবে, যে অত্যাচার তুমি চালাচ্ছ এরপরে কী পরিণতি হবে তোমার তা কি ভেবে দেখেছ?

আল্লাহ তাদের সহায়তা করবেন এবং তাদের বিজয় দান করবেন। বিশেষত এটা এমন এক সময় যখন মুসলিম জাতি নিজেদের সম্মানার্থে জেগে উঠছে এবং সামনের লড়াইয়ের জন্যে প্রস্তুত হয়েছে। ন্যায়সংগত লোকেরা এবং সর্বশক্তিমানের সহযোগীরা তঁর আদেশ মেনে তোমাদের এই আচরণে তীক্ষ্ণ

নজর রেখে চলছে। উপকূলবর্তী ঘাঁটিগুলোতে পুরুষ লোকের সমাবেশ ঘটছে। সাহসী এবং বীর পুরুষেরা, তারা যোদ্ধা এবং তাদের সক্ষমতা আমরা দেখেছি এবং তার কারণে তাদের মর্যাদাও উত্তরোত্তর বেড়ে চলছে।

আরও আছে, তোমার অবগতির জন্যে জানাই, এখানে নিয়োজিত আছে এমন সকল লোক যারা তাদের দীনের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ ও নিষ্ঠাবান। সেখানে নিয়োজিত নতুন এবং পুরাতন সকল লোকের সক্ষমতার কথাই তোমার জানা উচিত।

তাদের মাঝে আছেন এমন সকল ন্যায়পরায়ণ মানুষ যাদের প্রার্থনা আল্লাহ ফিরিয়ে দেন না, আর তাদের চাহিদার কথাও তিনি অবজ্ঞা করেন না। হ্যাঁ, এরাই হচ্ছেন এমন লোক যারা খুশি হলে আল্লাহও খুশি থাকেন; আর তারা অসন্তুষ্ট হলে আল্লাহও অসন্তুষ্ট হন।

হে সম্রাট! জেনে রেখো সে সকল মুসলিম সীমান্তের কথা যা তোমার রাজ্যের নানাদিকে বেষ্টিত করে আছে, কী কল্যাণ আর মঙ্গলের আশা তুমি করতে পার যখন কিনা আমাদের সাথে তোমাদের আচরণে কোন সুস্থ মস্তিষ্কের কেউ সন্তুষ্ট নয় এবং জানি না আর

নিশ্চয়ই আল্লাহ
মহাপবিত্র, মহামহিম।

তোমাকে উম্মাহর
ভাল-মন্দ দেখভালের

জন্যে ক্ষমতা দান
করেছেন, নির্বাচিত

করেছেন- এ কারণে এটা
আশা করা হয় যে, তুমি

ন্যায়নিষ্ঠার সাথে তোমার
দায়িত্ব পালন করবে এবং

অনুসরণ করবে তাঁর
রাসূলের নির্দেশনা।

লোকেদের সাথে বিনম্র
আচরণ করবে এবং

বিনয়ের সাথে অবনত
হবে।

কোন মুসলিম কিংবা আমাদের মুসলিমদের সাথে যারা শান্তি চুক্তি করেছে তারা এতে তোমাদের সাথে আপোস করতে রাজি হবে কিনা?

যখন বিখ্যাত আক্বাসীয় খলীফা আবু জাফর আল-মানসুরের বিরুদ্ধে ইব্রাহীম এবং মুহাম্মাদ বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন, খলিফা চেয়েছিল যেন সীমান্তবর্তী সৈনিকেরা বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করে। কিন্তু তারা তা প্রত্যাখান করল এবং তাদের অনেকেই রোমানদের হাতে বন্দি হলো। তখন রোমানরা বন্দিদের বিনিময়ে মুক্তিপণ দাবি করে বসল। কিন্তু খলীফা তাদের মুক্তিপণ দিতে অস্বীকার করলেন। এহেন অবস্থায়, ইমাম আওয়াসি (রহ.) খলীফার নিকট চরমপত্র লিখে পাঠালেন-

নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপবিত্র, মহামহিম। তোমাকে উম্মাহর ভাল-মন্দ দেখভালের জন্যে ক্ষমতা দান করেছেন, নির্বাচিত করেছেন- এ কারণে এটা আশা করা হয় যে, তুমি ন্যায়নিষ্ঠার সাথে তোমার দায়িত্ব পালন করবে এবং অনুসরণ করবে তাঁর রাসূলের নির্দেশনা। লোকেদের সাথে বিনম্র আচরণ করবে এবং বিনয়ের সাথে অবনত হবে। আমি আল্লাহ তাআলার নিকট এ মর্মে আবেদন পেশ করছি যেন তিনি আমীরুল মুমিনীনকে শান্ত করেন এবং উম্মাহর জনসাধারণের ব্যাপারে সদয় হবেন এবং তাদেরকে বিজয় দান করবেন। কার্যতই প্রথমবর্ষে মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের আক্রমণ সফল হয়েছে এবং মুসলিমদের সীমানার ভিতরে তারা অনুপ্রবেশ করতে পেরেছে। তারা মুসলিম নারীদের নিকট পৌঁছে গেছে এবং শিশু ও বৃদ্ধদেরকে দুর্গ হতে বের করে দিয়েছে। এ সবই ঘটেছে মুসলিমদের পাপের কারণে। যদিও যে অপরাধ আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছিলেন তা আরও বৃহৎ ছিল। এটা ছিল মুসলমানদের অপরাধ যে, তাদের শিশু ও বৃদ্ধদের দুর্গ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। অথচ তারা কোন সাহায্যকারী পায়নি কিংবা তাদের রক্ষার্থেও কেউ এগিয়ে আসেনি। নারীদের টেনে

হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তাদের মাথা আর পা অনাবৃত ছিল, আল্লাহ দেখলেন কিভাবে আমরা তাঁর থেকে সরে গিয়েছিলাম।

তাই বিশ্বাসীদের নেতার জন্যে মানানসই আচরণ হলো যে, তিনি আল্লাহকে ভয় করবেন এবং আল্লাহর নির্দেশিত পথের অনুসরণ করবেন মুক্তিপণ প্রদানের মাধ্যমে বন্দিদের মুক্ত করার দ্বারা। এই নির্যাতিত লোকদেরকে তিনি আল্লাহর ভালবাসার কসম করে মুসলিম উম্মাহ থেকে আলাদা করে রাখতে পারেন না। মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَا لَكُمْ لَا تَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

আর তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহর রাহে লড়াই করছ না দুর্বল সেসব পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান করো; এখানকার অধিবাসীরা যে অত্যাচারী! আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদেরও পক্ষালম্বনকারী নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও। (কুরআন, ৪: ৭৫)

আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, হে আমীরুল মুমিনীন! বন্দিদের কাছে না আছে কোন জমাকৃত মাল (গনীমত) না আছে কর দেয়ার মত কোন সম্পত্তি। কেবল তাদের নিত্য ব্যবহার্য সম্পদ ছাড়া।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ إِطْلَاقَهَا فَاسْتَمِعْ بُكَاءَ الصَّغِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي مِمَّا أَغْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمَّهِ مِنْ بُكَائِهِ

যখন আমি সালাত আরম্ভ করি, আমার মন চায় তা সুদীর্ঘ করতে। কিন্তু যখন আমার পিছনে কোন শিশুর কান্না শুনি তখন আমার সালাতের দৈর্ঘ্য সংক্ষিপ্ত করি, কারণ শিশুর কান্নার ফলে তার মায়ের মনে কষ্ট হয়। (বুখারি, হা. ন. ৭০৯)

কাজেই কীভাবে তাদেরকে আপনি

শত্রুদের হাতে ছেড়ে দিতে পারেন, হে আমিরুল মুমিনীন? তাদের উপর ফিতনা পতিত হয়েছে। তাদের দেহগুলো এভাবে উন্মুক্ত করে রাখা আছে যার কোন অনুমতি নেই কেবলমাত্র বিবাহিত নারী-পুরুষের মধ্যকার আন্তরিক অবস্থা ছাড়া, আর এরাই তো দুনিয়াতে আল্লাহর প্রতিনিধি। আপনার উপরে আছেন আল্লাহ, তিনি আপনাকে যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন শেষ বিচারের দিনে তার পূর্ণ হিসাব নিবেন- যেদিন কারো প্রতি অত্যাচার করা হবে না, যদিও একটি সরিষা দানা পরিমাণ কাজও হয়। তাঁর সিদ্ধান্তই আমাদের জন্য যথেষ্ট।

যখন পত্রটি আবু জাফরের নিকট পৌঁছল, তিনি আদেশ করলেন মুসলিমদের মুক্ত করার জন্যে মুক্তিপণ প্রদান করতে।

উলামায়ে কেরাম এই নির্যাতিত লোকদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন সর্বদাই। তারা আপনজন হারানো মায়ের হাহাকার কিংবা একজন পিতার বুকের শূন্যতা ও আর্তনাদ ঠিকই অনুভব করতেন। আর একারণেই তাঁরা তাদের দু'আয় মুসলিম বন্দিদের কথা স্মরণ করতেন।

ইমাম ইবনে কাসীর (রহ.) উল্লেখ করেছেন, একজন মহিলা এসে ইমাম বাকি বিন মুকাল্লাদ (রহ.) এর কাছে বললেন, নিশ্চয়ই আমার সন্তানকে ফ্রাঙ্কের লোকজনেরা ধরে নিয়ে গেছে এবং আমি সন্তান হারানোর ব্যথায় রাতে ঘুমাতে পারি না। আমার একটি সামান্য বাড়ি আছে যা আমি আমার সন্তানের মুক্তিপণ হিসেবে বিক্রি করে দিতে চাই। আপনি কি আমাকে এমন কোন ক্রেতার সন্ধান দিতে পারেন যিনি আমার এই বাড়িটি ক্রয় করবেন? আর আমি সেই টাকা দিয়ে আমার সন্তানকে মুক্ত করাতে পারি? আর আমার অবস্থা তো এমন যে, আমার নিজের দিন আর রাত একাকার হয়ে গেছে। চোখে ঘুম নেই, মনে শান্তি নেই, নেই কোন বিশ্রাম। (আর এ অবস্থা কি আজকের মায়াদেরও নয়? কিভাবে তারা ঘুমাতে পারেন যখন তারা জানেন তাদের প্রিয় সন্তানেরা বন্দি হয়ে আছে শত্রুদের

ইমাম ইবনে কাসীর (রহ.) উল্লেখ করেছেন, একজন মহিলা এসে ইমাম বাকি বিন মুকাল্লাদ (রহ.) এর কাছে বললেন, নিশ্চয়ই আমার সন্তানকে ফ্রাঙ্কের লোকজনেরা ধরে নিয়ে গেছে এবং আমি সন্তান হারানোর ব্যথায় রাতে ঘুমাতে পারি না। আমার একটি সামান্য বাড়ি আছে যা আমি আমার সন্তানের মুক্তিপণ হিসেবে বিক্রি করে দিতে চাই। আপনি কি আমাকে এমন কোন ক্রেতার সন্ধান দিতে পারেন যিনি আমার এই বাড়িটি ক্রয় করবেন? আর আমি সেই টাকা দিয়ে আমার সন্তানকে মুক্ত করাতে পারি? আর আমার অবস্থা তো এমন যে, আমার নিজের দিন আর রাত একাকার হয়ে গেছে। চোখে ঘুম নেই, মনে শান্তি নেই, নেই কোন বিশ্রাম।

হাতে- আল্লাহর নিকটই তারা ফরিয়াদ পেশ করে যাচ্ছেন।)

ইমাম বাকি বললেন, আচ্ছা! তুমি এখন যাও। আমি দেখছি আল্লাহর অনুমতিতে আমি এই ব্যাপারে কী করতে পারি। তিনি তাঁর মাথা অবনত করলেন, আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন যেন তিনি সেই মহিলার সন্তানকে ফ্রাঙ্কের কবল থেকে মুক্ত করে দেন। এরপর বেশি দিনের কথা নয়, যখন সেই মহিলাটি আবার আলেমের কাছে এলেন, এবার সাথে এলেন তার সন্তান! তার সন্তান মুক্তি লাভ করেছে! মহিলাটি বললেন, এর আজব ঘটনাটি শুনুন। আল্লাহ যেন তার উপর দয়া করেন।

বালকটি বলল, আমাকে সর্বদাই

শিকলে বেঁধে রাখা হত। একদিন আমি হাঁটছিলাম। হঠাৎ আমার পায়ে জড়ানো শিকল ছিঁড়ে গেল। কাজেই আমার পাহারাদার এসে আমাকে গালাগালি করল এবং প্রশ্ন করল, তুমি কেন তোমার পায়ের শিকল ভেঙেছ? আমি বললাম- না, আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি তো এটা স্পর্শও করিনি। এটা এমনিতেই খুলে গেছে, আমি টেরই পাইনি। কাজেই সে কামারকে ডেকে পাঠাল, সে আবার আমার পায়ে শিকল জড়িয়ে দিলো, ক্ষুণ্ণলো শক্ত করে বেঁধে দিল। যখন আমি উঠে দাঁড়িলাম তখন আবার আমার পায়ের শিকল ভেঙে গেল। এটা দেখে সে আবার শিকল শক্ত করে বেঁধে দিলো, আরো ভালোভাবে। কিন্তু এবারেও এটা খুলে গেল। তাই দেখে তারা তাদের পুরোহিতের কাজে এ বিষয়ে জানতে চাইল, সে বলল, বালকটির কি মা জীবিত আছে? আমি বলেছিলাম, হ্যাঁ। তারা বলল, নিশ্চয়ই তোমার মা তোমার জন্যে প্রার্থনা করেছে আর তা কবুল হয়েছে। তাকে ছেড়ে দাও। তাই তারা আমাকে ছেড়ে দিলো এবং ইসলামি রাজ্যে প্রবেশ পর্যন্ত আমাকে পাহারা দিয়ে নিয়ে এলো।

বাকি বিন মুকাল্লাদ (রহ.) আরও জানতে চাইলেন বালকটির কাছে- ঠিক কখন তার পায়ের শিকল ছিঁড়ে যাবার এই ঘটনাটি ঘটেছিল। তিনি অবাক হয়ে গেলেন যে, এটা ছিল সেই সময় যখন তিনি বন্দিদের মুক্তির জন্যে দু'আ করছিলেন।

আজকের মুসলিম উলামারা কি সেই অনন্য পথ অনুসরণ করছেন এবং বন্দিদের মুক্ত করার ব্যাপারে ভূমিকা পালন করছেন? যারা দায়িত্বশীল তাদের কি আজকের উলামারা উপদেশ দিচ্ছেন? তাদের কি উৎসাহিত করছেন যেন তারা বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে? হে আল্লাহ! আমি কি আমার বার্তা পৌঁছাতে পেরেছি? হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন। আল্লাহ আমাকে এবং আপনাকে এই বরকতময় কুরআন দ্বারা উপকৃত করুন।

-চলবে, ইনশাআল্লাহ

কখনও ঝরে যেও না

তারেক মেহান্না



মুমিন ব্যক্তি হচ্ছে বৃক্ষের মতো; দমকা হাওয়ার সাথে সর্বদা যুদ্ধে লিপ্ত। এই প্রবল বাতাসের ঝাপটার মাঝে বেঁচে থাকতে হলে সে বৃক্ষটির কিছু গুণ থাকা চাই। যেমন, সুন্দরভাবে বেড়ে উঠতে হলে গাছটির বীজ অবশ্যই উর্বর মাটিতে বপন করতে হবে। কুরআনে ঠিক এ কথাটাই বলা আছে—

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ تَرُزَّعٌ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيُغَيِّظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল এবং তার সাথে যারা আছে তারা কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর; কিন্তু পরস্পরের প্রতি সদয়। তুমি তাদেরকে রুকুকারী, সিজদাকারী অবস্থায় দেখতে পাবে। তারা আল্লাহর করুণা ও সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করছে। তাদের আলামত হচ্ছে, তাদের চেহারা সিজদার চিহ্ন থাকে। এটাই তাওরাতে তাদের দৃষ্টান্ত। আর ইনজীলে তাদের দৃষ্টান্ত

হলো একটি চারাগাছের মতো, যে তার কঁচিপাতা উদগত করেছে ও শক্ত করেছে, অতঃপর তা পুষ্ট হয়েছে ও স্থায়ী কাণ্ডের উপর মজবুতভাবে দাঁড়িয়েছে, যা চাষীকে আনন্দ দেয়। যাতে তিনি তাদের দ্বারা কাফিরদেরকে ক্রোধান্বিত করতে পারেন। তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপ্রতিদানের ওয়াদা করেছেন। (৪৮: ২৯)

তাওরাতের নিম্নোক্ত বিবরণটির কথা এখানে বলা হয়েছে:

...কৃষক তার বীজ বুনতে বের হলো। বপনের সময় কিছু বীজ পথের পাশে পড়ল। সেগুলোর কিছু পায়ের নিচে পিষ্ট হয় আর কিছু পাখিরা খেয়ে ফেলে। কিছু বীজ পড়ল পাথুরে মাটিতে। অর্দিতার অভাবে সেগুলো বড় হতে হতেই শুকিয়ে গেলো। কিছু বীজ কাঁটার মাঝে পড়ল। ঐ বীজ থেকে জন্ম নেওয়া গাছের সাথে সাথে কাঁটাগুলোও বেড়ে উঠতে থাকে। একসময় কাঁটাগুলোই গাছগুলোকে মেরে ফেলে। বাকি বীজগুলো পড়ল উর্বর মাটিতে। সেগুলো বেড়ে উঠল

কৃষক তার বীজ বুনতে বের হলো। বপনের সময় কিছু বীজ পথের পাশে পড়ল।

সেগুলোর কিছু পায়ের নিচে পিষ্ট হয় আর কিছু পাখিরা খেয়ে ফেলে। কিছু বীজ পড়ল পাথুরে মাটিতে। অর্দিতার অভাবে

সেগুলো বড় হতে হতেই শুকিয়ে গেলো। কিছু বীজ কাঁটার মাঝে পড়ল। ঐ বীজ থেকে জন্ম নেওয়া গাছের সাথে সাথে কাঁটাগুলোও বেড়ে উঠতে থাকে।

একসময় কাঁটাগুলোই গাছগুলোকে মেরে ফেলে। বাকি বীজগুলো পড়ল উর্বর মাটিতে। সেগুলো বেড়ে উঠল মাথা উঁচু করে। আর বেড়ে উঠে শতগুণ বেশি শস্য উৎপাদন করল।

রাসূল (সা.) বিশেষভাবে মুনাফিককে এমন গাছের সাথে তুলনা করেছেন যেটা বাতাসের সাথে সাথে নড়ে এবং কখনো বা পড়ে যায়। সুতরাং তারা দলে দলে বাতাসের ধাক্কায় পড়ে যাক, তুমি তাদের মতো হয়ো না। বরং তুমি তাদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করো। আল্লাহকে ধন্যবাদ দাও যে, তিনি তোমাকে তাদের পরিণতি থেকে রক্ষা করেছেন এবং তারপর এগিয়ে যাও। তাদের জন্য ইসলাম ছিল একটা শখ মাত্র, এ সপ্তাহের আকর্ষণ!

যখন তোমার হৃদয়ে ঈমানের সুদৃঢ় বৃক্ষ গড়ে উঠবে, তখন একটা দমকা হাওয়া তোমার দিকে ধেয়ে আসবে। কারণ উপরে বর্ণিত আয়াত অনুযায়ী, আল্লাহ বলছেন শক্ত গাছটি 'কাফেরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করে।' একজন দৃঢ় মুসলিম এর মতো আর কোনো কিছুই এই বাতাসকে এতটা ক্ষেপিয়ে তোলে না। আর এটাই চিরন্তন বাস্তবতা। যখন ফেরআউন মূসা (আলাইহিস সালাম) এবং তাঁর অনুসারীদের পিছনে মিশরের মরুভূমিতে ধাওয়া করছিল তখন সে সুনির্দিষ্টভাবে অভিযোগ করে:
إِنْ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ... وَإِنَّهُمْ لَغَائِظُونَ

নিশ্চয়ই এরা (বনী ইসরাঈল) ক্ষুদ্র একটি দল। অথচ তারা আমাদের ক্রোধের উদ্বেক করেছে। (কুরআন, ২৬: ৫৪-৫৫)

এই দমকা হাওয়া তোমাকে সমূলে উচ্ছেদ করে ফেলতে চাইবে। তুমি হয়ত চারিদিকে তাকিয়ে অন্য কিছু গাছকে সহজেই পড়ে যেতে দেখবে। কেউ হয়ত বাতাসের ধাক্কায় সমূলে উৎপাটিত হয়ে যাবে। এরা হল মুনাফিক। এদের দুর্বল মূল সহজেই প্রকাশ হয়ে পড়ে—

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ
আর নোংরা বাক্যের উদাহরণ হলো নোংরা বৃক্ষ। একে মাটির উপর থেকে উপড়ে নেয়া হয়েছে। এর কোনো স্থিতি নেই। (কুরআন, ১৪: ২৬)

রাসূল (সা.) বিশেষভাবে মুনাফিককে এমন গাছের সাথে তুলনা করেছেন যেটা বাতাসের সাথে সাথে নড়ে এবং কখনো বা পড়ে যায়। সুতরাং তারা দলে দলে বাতাসের ধাক্কায় পড়ে যাক, তুমি তাদের মতো হয়ো না। বরং তুমি তাদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করো। আল্লাহকে ধন্যবাদ দাও যে, তিনি তোমাকে তাদের পরিণতি থেকে রক্ষা করেছেন এবং তারপর এগিয়ে যাও। তাদের জন্য ইসলাম ছিল একটা শখ মাত্র, এ সপ্তাহের আকর্ষণ!

মাথা উঁচু করে। আর বেড়ে উঠে শতগুণ বেশি শস্য উৎপাদন করল। এর তুলনা হলো এই: বীজগুলো হলো সৃষ্টিকর্তার বাণী। কিছু মানুষ সেই বাণী শোনার পর শয়তানের প্ররোচনায় সেগুলো অন্তর থেকে মুছে ফেলে। ফলে এরা ঈমান আনে না। তাই পরিশেষে এরা রক্ষা পাবে না। এদের তুলনা হচ্ছে পথের পাশের সেই অবহেলিত জমি।

কিছু লোক শোনার সময় আগ্রহের সাথে শোনে কিন্তু এদের আগ্রহে গভীরতা নেই। এরা কিছু সময়ের জন্য বিশ্বাস করে। কিন্তু প্রলোভন দেখালেই বিচ্যুত হয়ে পড়ে। এই শ্রেণির লোকের উদাহরণ হলো সেই পাথুরে মাটি যা অর্দ্রতার অভাবে গাছগুলোকে বেড়ে উঠতে দিতে পারে না। কাঁটায়ুক্ত জমি হচ্ছে তাদের উপমা যারা সৃষ্টিকর্তার বাণী শুনেছে কিন্তু পথ চলতে চলতে একসময় ভয় আর দুনিয়ার মোহে আটকে গিয়ে পূর্ণতা লাভ করতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু কিছু লোক সৎ এবং বিশুদ্ধ হৃদয় নিয়ে সৃষ্টিকর্তার বাণী শুনে তা আঁকড়ে ধরেছিল এবং ধৈর্যের সাথে পরিশেষে ফল লাভ করেছিল। এদের

উদাহরণ হচ্ছে সেই উর্বর মাটি যা বীজকে বুকে নিয়ে মহীরুহের জন্য দেয়। (লুক ৮: ৫-১৫)

অর্থাৎ, হৃদয়কে এমন উর্বর মাটির সাথে তুলনা করা হয়েছে যেখানে বীজ বপন করা হয়। ইমাম ইবনুল কাইয়িম (রহিমাহুল্লাহ) আল-ফাওয়াইদ গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৭০) এভাবেই বলেছেন,

“সবার হৃদয়ের স্বাভাবিক অবস্থাই হচ্ছে উর্বর, এতে যা বপন করা হয় তাই সহজে বেড়ে উঠে। যদি ঈমান এবং তাকওয়ার চারা এতে রোপণ করা হয়, তবে তা এমন সুমিষ্ট ফল দান করবে যা হবে চিরন্তন। আর যদি অজ্ঞতা এবং কামনা-বাসনার চারা রোপণ করা হয় তাহলে তার ফল হবে তিক্ত এবং কটু।”

তাই তুমি যখন তোমার অন্তরকে ঈমানের বীজের জন্য উর্বর করে তুলবে, তখন সেই গাছটি সুন্দর ভাবে বেড়ে উঠবে এবং মিষ্টি ফল ধারণ করবে। হৃদয়কে উর্বর করার উপায়গুলো সামনে আলোচনা করা হবে।

যখন বাতাস বুঝতে পারবে যে, তোমাকে এভাবে মাটি থেকে সরাসরি তুলে ফেলা সম্ভব নয়, তখন সে আরো সূক্ষ্ম পন্থা অবলম্বন করবে। সে চেষ্টা করবে তোমার পাতাগুলো কৌশলে ঝরিয়ে দিতে। কিন্তু সে তোমাকে সবগুলো পাতা একসাথে ঝরাতে বলবে না। কারণ সেটা তো তার দুরভিসন্ধি প্রকাশ করে দেবে। বরং তখন সেই বাতাস মৃদুভাবে বইবে যাতে করে তোমার একটা পাতা ঝরাতে পারে, তারপর আরেকটা, তারপর আরেকটা—এভাবে যতক্ষণ না তুমি পাতাহীন বৃক্ষে পরিণত হও। উস্তাদ সাইয়িদ কুতুব এটা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—

“কোনো আদর্শের পক্ষে অবস্থান নেওয়া গোষ্ঠীর প্রতি শাসকবর্গের আচরণ এমন হয় যে, তারা সবসময় কূটকৌশলের মাধ্যমে সেই আদর্শিক গোষ্ঠীকে তাদের দৃঢ় অবস্থান থেকে শুধু সামান্য বিচ্যুত করতে চায়। তারা এর মাধ্যমে একটা সমঝোতামূলক সমাধানে আসতে চায়। কিছু জাগতিক পুরস্কারের বিনিময়ে তারা তাদেরকে বোকা বানাতে চেষ্টা করে। এমন অনেকেই রয়েছে যারা ভাবে যে, তারা তাদের আদর্শের জন্য লড়ছে। কিন্তু বস্তুত তাদেরকে সমঝোতা আর আপসের ছদ্মাবরণে তাদের আদর্শ থেকেই বিচ্যুত করে দেয়া হয়েছে। কারণ তারা আদর্শকে জলাঞ্জলি দেয়া এই সমঝোতাগুলোকে বড় করে দেখে না। তাই বিরোধীপক্ষও তাদেরকে প্রকাশ্যভাবে আদর্শ ত্যাগ করতে বলে না। বরং এদিকে সেদিকে হালকা পরিবর্তন করতে অনুরোধ করে, যাতে উভয়পক্ষ মাঝখানে মিলিত হতে পারে।

যে মানুষটি আদর্শের পক্ষে লড়ছে শয়তান তাঁকে ধোঁকা দিতে বলে, কর্তৃপক্ষের সাথে সামান্য সমঝোতার মাধ্যমে তো তুমি তোমার আদর্শকে আরো সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু পথের শুরুতে যে বিচ্যুতি খুব সামান্য হয়, পথের শেষে তা-ই বিশাল হয়ে দেখা দেয়। আদর্শের পতাকাবাহীরা আপাতদৃষ্টিতে ক্ষুদ্র কোনো বিষয়ে আপস করতে রাজি হওয়ার পর আসলে সেখানেই থেমে

যে মানুষটি আদর্শের পক্ষে লড়ছে শয়তান তাঁকে ধোঁকা দিতে বলে, কর্তৃপক্ষের সাথে সামান্য সমঝোতার মাধ্যমে তো তুমি তোমার আদর্শকে আরো সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু পথের শুরুতে যে বিচ্যুতি খুব সামান্য হয়, পথের শেষে তা-ই বিশাল হয়ে দেখা দেয়। আদর্শের পতাকাবাহীরা আপাতদৃষ্টিতে ক্ষুদ্র কোনো বিষয়ে আপস করতে রাজি হওয়ার পর আসলে সেখানেই থেমে যেতে পারে না। কারণ এরপর যখনই এক পা পিছিয়ে যাওয়ার অবস্থা সৃষ্টি হবে তখনি সেটা ঠেকাতে তার সমঝোতায় আসার ইচ্ছা আরো বৃদ্ধি পাবে। তাই কর্তৃপক্ষ এই আদর্শবাদীদেরকে অতি সন্তর্পণে এবং ক্রমান্বয়ে তাদের আদর্শ থেকে টলাতে থাকে।”

যেতে পারে না। কারণ এরপর যখনই এক পা পিছিয়ে যাওয়ার অবস্থা সৃষ্টি হবে তখনি সেটা ঠেকাতে তার সমঝোতায় আসার ইচ্ছা আরো বৃদ্ধি পাবে। তাই কর্তৃপক্ষ এই আদর্শবাদীদেরকে অতি সন্তর্পণে এবং ক্রমান্বয়ে তাদের আদর্শ থেকে টলাতে থাকে।”

তাই এই ফাঁদে পা দিবে না। বাতাসের মুখে একটা পাতাকেও ঝরতে দেবে না। যেভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) মুনাফিককে বাতাসের সাথে নুয়ে পড়া গাছের তুলনা দিয়েছেন তেমনি ভাবে মুমিনকে খেজুর গাছের সাথে তুলনা করেছেন। কারণ খেজুর গাছের পাতা কখনো ঝরে না। বাতাস যতই তীব্র হোক না কেন তার সামনে মুসলিম শুধু দাঁড়িয়েই থাকে না, বরং সব পাতা মেলে মাথা উঁচু করে থাকে। বাতাস যত তীব্র হবে তোমার পাতাগুলোকে

আরো শক্ত করে আঁকড়ে ধরবে। আর এ জন্যই তো তোমার বিরুদ্ধে বাতাসের এত ক্ষোভ!

وَمَا تَقْضُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

তারা মুমিনদেরকে নির্যাতন করতো শুধুমাত্র এ কারণে যে, তারা মহাপরাক্রমশালী প্রশংসিত আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছিল। [কুরআন, ৮৫: ৮]

কিন্তু এই বাতাস তার ক্ষোভের পেছনে ভিন্ন কারণ দাঁড় করিয়ে এই বাস্তবতাকে লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করবে। সে দাবি করবে এই রাগ আসলে তোমার বিরুদ্ধে নয়। এই রাগ তো কেবল উগ্রবাদ, জঙ্গিবাদ কিংবা অন্য কোনকিছুর বিরুদ্ধে। কিন্তু সত্য কথাটা হচ্ছে যাদেরকে সে সমূলে তুলে ফেলতে পারে না, যাদেরকে তাদের

আদর্শ থেকে এক বিন্দুও টলানো যায় না। এইসব মুসলিমদেরকে সে ভারি অলঙ্ঘন করে। আর যখন গাছটা একটা পাতাও ভাঙ করতে অস্বীকার করে তখন সেই বাতাস আরো রেগে যায়। আর যখন এই বাতাস রাগতে থাকবে, তখন আল্লাহ তোমাকে পুরস্কৃত করবেন—

لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا لُغْظَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نِيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغْنِيهِمْ أَجْرَ الْمُخْسِنِينَ

অর্থ: তাদেরকে আল্লাহর পথে তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধায় আক্রান্ত করে এবং তাদের এমন পদক্ষেপ যা কাফিরদের ক্রোধ জন্মায় অথবা শত্রুদেরকে তারা ক্ষতিসাধন করে, এসবই তাদের জন্য লিপিবদ্ধ করা হয় 'আমলে সালেহ' হিসেবে। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদের প্রতিদান নষ্ট করেন না। [কুরআন, ৯: ১২০]

তাই যখন প্রবল আক্রোশে বাতাস বইবে তখন ভয় পেও না। বরং তার চোখে চোখ রাখো আর:

قُلْ مُوتُوا بِغَنِيظِكُمْ
বলো, তোমরা আক্রোশে মরতে থাকো। [কুরআন, ৩: ১১৯]

ঐ পাতাগুলো হচ্ছে আল্লাহর তরফ থেকে তোমার প্রতি আমানত। আল্লাহ তোমাকে এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করতে দিয়েছেন। যদি তুমি তার খিয়ানত কর তবে তোমাকে এমন মানুষ দ্বারা পরিবর্তন করে দেয়া হবে যারা তাদের আমানত রক্ষা করবে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ بِكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِيَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ

হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় দীন থেকে ফিরে যাবে, অচিরেই আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে

জিহাদ করবে এবং কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ। তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। [কুরআন, ৫: ৫৪]

এই আয়াতটি খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে গাছ এবং পাতাগুলোর বর্ণনা দেয়। এটাকে বীজ এবং পাতায় বিশ্লেষণ করা যাক—

সম্পূর্ণ গাছটি হচ্ছে দীন।

তোমার অন্তরে আল্লাহর জন্য ভালবাসার বীজ থেকে এই গাছটি অঙ্কুরিত হবে। আত-তুহফাহ আল ইরাকিয়াহ নামে ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) এর একটি সুন্দর প্রবন্ধ রয়েছে। মাজমু আল ফাতওয়ার দশম খন্ডের শুরুতে এটি পাওয়া যাবে। সেখানে তিনি এই আয়াতে উল্লেখিত ভালবাসার কথা ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে—

“আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের জন্য ভালবাসা হচ্ছে ঈমানের সর্বোচ্চ বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে একটি এবং ঈমানের সর্বোচ্চ মূলনীতি। কার্যত এটিই দীনের সকল আমলের মূল ভিত্তি। মুসা এবং ঈসা (আ.) এর বর্ণিত ভাষ্য অনুযায়ী, আমাদের পূর্ববর্তী দুটি জাতি, ইহুদি এবং খৃস্টানদের প্রতি রেখে যাওয়া সর্বোত্তম উপদেশ হচ্ছে

মানুষ যাকে
ভালবাসে তার
ভালবাসার
মানুষকেও
ভালবাসে, সে যা
ঘৃণা করে তাও ঘৃণা
করে, তার
সহযোগীদের প্রতি
বিশ্বস্ত থাকে, তার
শত্রুদের প্রতি
শত্রুভাব পোষণ
করে। তাই এই
বিষয়ে তারা উভয়েই
এক

হৃদয়, মন এবং সদিচ্ছা দ্বারা সর্বাস্তরূপে আল্লাহকে ভালবাসা। এটাই ইব্রাহীম (আ.) এর দীনের আকীদার সারকথা যা তাওরাত, ইঞ্জীল এবং কুরআনের আইনের নির্যাস।”

আল্লাহর জন্য ভালবাসাই হচ্ছে সেই বীজ যা থেকে প্রতিটি কাজ এবং বিশ্বাস, প্রতিটি পাতা এবং ফল অঙ্কুরিত হয় আর এজন্যই এই ভালবাসাটাই এ আয়াতে সর্বপ্রথম উল্লেখ করা হয়েছে।

তারপর আমরা লাভ করব সেই বীজের প্রথম ফল,

আল-ওয়াল্লা ওয়াল বারাতা :

أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُنَافِقِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ
‘মুসলমানদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে।’
ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ এ বিষয়ে বর্ণনা করেন,
“মানুষ যাকে ভালবাসে তার ভালবাসার মানুষকেও ভালবাসে, সে যা ঘৃণা করে তাও ঘৃণা করে, তার সহযোগীদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকে, তার শত্রুদের প্রতি শত্রুভাব পোষণ করে। তাই এই বিষয়ে তারা উভয়েই এক।”
সহজ ভাষায় বললে, বাতাসের প্রথম কাজ হচ্ছে তোমার এই পাতাটি ঝরিয়ে দেয়া যাতে করে তোমার মনে শত্রু আর বন্ধুর মাঝে বিভাজন রেখাটা অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। একবার যখন তুমি তোমার শত্রুকে বন্ধু ভাববে, তোমার শত্রুর কাজ তখনি সম্পন্ন হয়ে যাবে। তাই কখনও এই পাতাটি ঝরে যেতে দিবে না। কখনো না।

এর পরের পাতাটি হচ্ছে, জিহাদ:

يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
‘তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে।’
স্পষ্টতই এই পাতাটিকে বাতাস অন্যগুলোর চেয়ে বেশি ঘৃণা করে। কেন? তা বোঝার জন্য এইডস এর কথা ভাবো। এটা শরীরকে মেরে ফেলার জন্য কী করে? এইডস কিন্তু সরাসরি শরীরকে আক্রমণ করে না বরং এটি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে অর্থাৎ শরীরের ‘প্রতিরক্ষা



বাহিনীকে আক্রমণ করে যাতে করে অন্যান্য রোগ-জীবাণু কোনোরকম বাধা ছাড়াই আক্রমণ করতে পারে। এই শরীরটা হচ্ছে মুসলিম উম্মাহর মতো। জিহাদ হচ্ছে এর রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা যার মাধ্যমে সে আক্রমণকারীদের থেকে নিজেকে রক্ষা করে। আর সেই বাতাস হচ্ছে এইডসের মতো যা প্রতিরোধের এই স্পৃহাটাকে মেরে ফেলার জন্য কাজ করে। যাতে করে মুসলিম উম্মাহকে আক্রমণ এবং দখল করে নেওয়া সহজ হয়ে যায়। এই কারণেই উস্তাদ সাইয়িদ কুতুব, আব্দুল্লাহ আযযাম, আয-যারকাওয়ী, শাইখ ওসামা (রহিমাল্লাহু) প্রমুখদের মতো লোকদেরকে আজ দানবরূপে চিত্রিত করা হয়। কারণ এরা প্রতিরোধের সেই চেতনাকে ধারণ করেন। আর তাই তোমার এই পাতাটি ঝরিয়ে দিতেই বাতাস সবচে জোরে বইবে। এই ফাঁদে পা দিও না। মনে রেখো, এইডস!

সুদূর বৃক্ষ সেটাই, যা

لَا يَخَافُونَ لَوْمَةً لَّائِمَةً

‘কোনো নিন্দাকারীর নিন্দায় ভীত হবে না।’

বস্তুত বৃক্ষটি তিরস্কার বা নিন্দায় প্রভাবিত হবে। কিন্তু সেভাবে নয়, যেমনটি আশা করা হয়েছিল। সেটা কেমন হবে? যখন বাতাস তোমার

পাতাগুলো ঝরিয়ে দিতে চায়, যখন আল-ওয়াল্লা ওয়াল বারআ আর জিহাদের ধারণাকে আঁকড়ে ধরে রাখার কারণে সে তোমাকে আক্রমণ আর তিরস্কার করে তখন ইমাম ইবনু তাইমিয়ার ভাষায় তোমার প্রতিক্রিয়া হবে এমন— “যার হৃদয় আল্লাহর জন্য ভালবাসায় পরিপূর্ণ সে অন্য কারো সমালোচনা বা তিরস্কারে দমে যায় না বরং এগুলো তাকে আরো শক্তভাবে দীনকে আঁকড়ে ধরতে প্রেরণা যোগায়।”

সবশেষে এই আয়াত আমাদেরকে সেই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি দেয় যে, কুরআনের এই শিক্ষাগুলোর প্রতি সৎ থাকতে পারা হলো,

রবের একান্ত অনুগ্রহ

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ

‘এটা আল্লাহর অনুগ্রহ। তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন।’ বাতাসের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারাটা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহুর একটা অনুগ্রহ। একটা গাছকে সোজা হয়ে দাঁড় করিয়ে রাখতে বা ধূলায় মিশিয়ে দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী—

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ - أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ
الزَّارِعُونَ - لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ
تَفَكَّهُونَ

তোমরা যে বীজ বপন কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? তোমরা তাকে

উৎপন্ন কর, না আমি উৎপন্নকারী? আমি ইচ্ছা করলে তাকে খড়কুটা করে দিতে পারি, অতঃপর হয়ে যাবে তোমরা বিস্ময়াবিষ্ট। [কুরআন, ৫৬: ৬৩-৬৫]

শেষ বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে সতর্ক করেছেন যে, শেষ যামানায় কারো বদলে যাওয়াটা খুব সহজ হয়ে পড়বে। মানুষ চাপে পড়ে এবং নিজেদের দুর্বলতার কারণে খুব দ্রুত সত্যকে ত্যাগ করবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (ر) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ:
بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتْنًا كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ
يُضْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُفْجِرُ أَوْ يُفْجِرُ
مُؤْمِنًا وَيُضْبِحُ كَافِرًا يَبِيعُ دِينَهُ بِغَرَضٍ مِنَ
الدُّنْيَا

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমরা অন্ধকার রাতের ন্যায় ফিতনা আবির্ভাবের পূর্বেই দ্রুত আমল করে নাও। (কেননা তখন পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ হবে যে,) কেউ সকালে মুমিন থাকলে সন্ধ্যায় হবে কাফির, আর সন্ধ্যায় মুমিন থাকলে সকালে হবে কাফির। তখন তারা দীনকে বিক্রি করবে সামান্য দুনিয়ার বিনিময়ে। (সহীহ মুসলিম: ৩২৮, সহীহ ইবনে হিব্বান: ৬৭০৪, সুনানে তিরমিযি: ২১৯৫, মুজামুল আওসাত: ২৭৭৪, মুসনাদে আহমাদ: ১০৭৮২, সিলসিলা সহীহা: ৭৫৮, মিশকাত: ৫৩৮৩)

এ ধরনের ঘটনাগুলো হচ্ছে কিছু অজানা বা গায়েবি ঘটনার ফল, যা আমরা মানুষেরা হয়তো ঠিক উপলব্ধি করতে পারব না। তবে, কুরআন এবং সুন্নাতে এমন কিছু ব্যবহারিক উপায় বলে দেয়া আছে যার সাহায্যে আমরা মানবসভ্যতার ইতিহাসের সঠিক পক্ষে থাকতে পারি। এখানে আমরা শুধু দুটি উপায় আলোচনা করব এবং দুটিই একটি মজবুত বৃক্ষের দৃঢ়তার সর্বপ্রথম শর্তটির উপর আলোকপাত করে:

উর্বর জমি— একটি সুস্থ হৃদয়

১। রাসূলুল্লাহ (সা.) মক্কায় যখন কঠিনতম পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর প্রতি নাযিলকৃত সূরাসমূহের মূল বিষয় ছিল পূর্ববর্তী নবীদের কাহিনী। ইসলামের জন্য কঠিন

পরীক্ষার সম্মুখীন যে তিনিই প্রথম নন, বরং যুগে যুগে এমন আরো অনেকেই ছিলেন, এটা বোঝানোই ছিল এর উদ্দেশ্য। একই সাথে আগের নবীরা কীভাবে এসব পরীক্ষার মুকাবিলা করেছিলেন সে শিক্ষাও তাঁকে এর মাধ্যমে দেয়া হচ্ছিল। মক্কার বিপদের ঘনঘটায় আচ্ছন্ন দিনগুলোতে এই ইতিহাসের গল্পগুলো রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং সাহাবীদের মনোবল দৃঢ় করতে বিশাল ভূমিকা রেখেছিল। এ কথাটিই নিমোক্ত আয়াতে প্রতিফলিত হয়,

وَلَا تَقْصُصْ عَلَيْنِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نَنْتَبِهُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ

আর আমি রসূলগণের সব বৃত্তান্তই তোমাকে বলছি, যদ্বারা তোমার অন্তরকে মযবুত করছি। আর এভাবে তোমার নিকট মহাসত্য এবং ঈমানদারদের জন্য নসীহত ও স্মরণীয় বিষয়বস্তু এসেছে। [সূরা কুরআন, ১১: ১২০]

একইভাবে প্রথম দিককার মুসলিমদের সেইসব কঠোর পরীক্ষার দিনগুলোর পাশাপাশি ইতিহাস, বিশেষভাবে সেই সকল মুসলিমদের ইতিহাস অধ্যয়ন করাটা উপকারী হতে পারে যারা তাদের সময়ে কোনো না কোনো প্রকারের সাহসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অনেক সময় কোনো পরিস্থিতিতে আমাদের করণীয় বুঝে উঠতে আমরা ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে ফিকহের বই ঘাঁটি যেখানে শুধুমাত্র সংকর্মশীলদের জীবনী পড়েই তাদের ব্যক্তিত্বকে আত্মস্থ করার মাধ্যমে আমাদের করণীয় সম্বন্ধে আরও ভাল দিকনির্দেশনা পেতে পারি। সাফাহাত মিন সবর আল উলামা (আলেমদের সবরের পাতা থেকে) নামক অসাধারণ বইটিতে লেখক বলেন:

“নিজের মধ্যে সংগুণের বিকাশ ঘটানোর এবং মহৎ উদ্দেশ্যে কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকারের মানসিকতা তৈরি করার একটি ভাল উপায় হচ্ছে সেই সকল আলেমদের জীবনী পড়া যারা তাঁদের অর্জিত ইলমের উপর আমল করেছেন। মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য অধ্যবসায়ের সাথে ত্যাগ স্বীকার করে যাওয়া আলেমদের পদাঙ্ক অনুসরণের ক্ষেত্রে

সংকর্মশীলদের জীবনী অধ্যয়ন, তাঁদের ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্রকে আপন করে নেয়া অন্তরকে শক্তিশালী এবং জীবন্ত করার একটি ভাল উপায়। এটি ঈমান এবং ইলমের বীজ বপনের জন্য অন্তরকে উর্বর করে তোলে। তাহলে কোথা থেকে শুরু করা উচিত?

শায়খ ইবনুল জাওয়ী (রাহিমাল্লাহ), সাইদ আল খাতির গ্রন্থের ৬০ পৃষ্ঠায় বলেন, “রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং তাঁর সাহাবীদের জীবনী থেকেই সবচেয়ে বেশি উপকারী জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব।”

তাদের জীবনী পড়াটা ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। বলা হয়ে থাকে, এই কাহিনীগুলো হচ্ছে আল্লাহুর সেই সকল সৈন্য যার মাধ্যমে আল্লাহুর তাঁর প্রিয়পাত্রদের অন্তরকে সুস্থির রাখেন।” ইমাম আবু হানীফা (রাহিমাল্লাহ) বলেন, “আলেমদের জীবনী এবং তাঁদের গুণাবলি অধ্যয়ন আমার কাছে ইলমের চেয়ে বেশি প্রিয়। কারণ এগুলো তাঁদের চরিত্র বর্ণনা করে।”

তাই সংকর্মশীলদের জীবনী অধ্যয়ন, তাঁদের ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্রকে আপন করে নেয়া অন্তরকে শক্তিশালী এবং জীবন্ত করার একটি ভাল উপায়। এটি ঈমান এবং ইলমের বীজ বপনের জন্য অন্তরকে উর্বর করে তোলে। তাহলে কোথা থেকে শুরু করা উচিত? শায়খ ইবনুল জাওয়ী (রাহিমাল্লাহ), সাইদ আল খাতির গ্রন্থের ৬০ পৃষ্ঠায় বলেন, “রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং তাঁর সাহাবীদের জীবনী থেকেই সবচেয়ে বেশি উপকারী জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব।”

২। অন্তরকে দৃঢ় করার দ্বিতীয় উপায়টি আরো সহজ। শুধু তোমার রবের কাছে চাও!

উম্মু সালামা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, রাসূলুল্লাহ (সা.) কোন দুআটি সবচেয়ে বেশি করতেন। উত্তরে তিনি বলেন, তাঁর সবচেয়ে বেশি করা দুআটি ছিল—

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ
হে অন্তরসমূহের নিয়ন্ত্রণকারী! আমার অন্তরকে তোমার দীনের উপর স্থির করে দাও। [মুসনাদে আহমাদ: ২৬৬৭৯]

এই দুআটি সারাদিন সবসময় অভ্যাস করা উচিত। কাজে যাওয়ার সময় কিংবা স্কুলের বারান্দা দিয়ে হাঁটার সময় যখন সুযোগ পাওয়া যায় তখনই এই সহজ দুআটি পুনরাবৃত্তি করার অভ্যাস করা উচিত। গুপ্তধনের মতো এই দুআটিকে আঁকড়ে রাখা উচিত এবং সর্বদা এটিকে ঠোঁটের ডগায় রেখে অন্তরকে ইসলামের সাথে সংযুক্ত করে রাখা উচিত। এটা খুবই সহজ হওয়া সত্ত্বেও যাদের খুব প্রয়োজন তাদের অনেকেই এটিকে অবহেলা করে।

হৃদয়কে স্থির এবং সুস্থ রাখার মাধ্যমে, অন্তরের জমিকে উর্বর রাখার মাধ্যমে তোমার শিকড়কে সুদৃঢ় করো। আর মযবুত শিকড়বিশিষ্ট গাছগুলোর শাখা-প্রশাখাই একদিন আকাশ ছোঁয়—
كَلِمَةُ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَضَلُّهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ

পবিত্র বাক্য হলো পবিত্র বৃক্ষের মতো। তার শিকড় মজবুত এবং শাখা আকাশে উঠিত। [কুরআন, ১৪: ২৪]

আর যখন তোমার শাখা-প্রশাখা আকাশ ছোঁবে, তখন কেউ তোমার পাতা পর্যন্ত পৌঁছুতেই পারবে না। তারা তোমাকে বন্দি করতে পারে, তোমাকে হত্যা করতে পারে কিন্তু তারা কখনো এ কথা বলতে পারবে না যে, তারা তোমার পাতা ঝরাতে পেরেছিল।

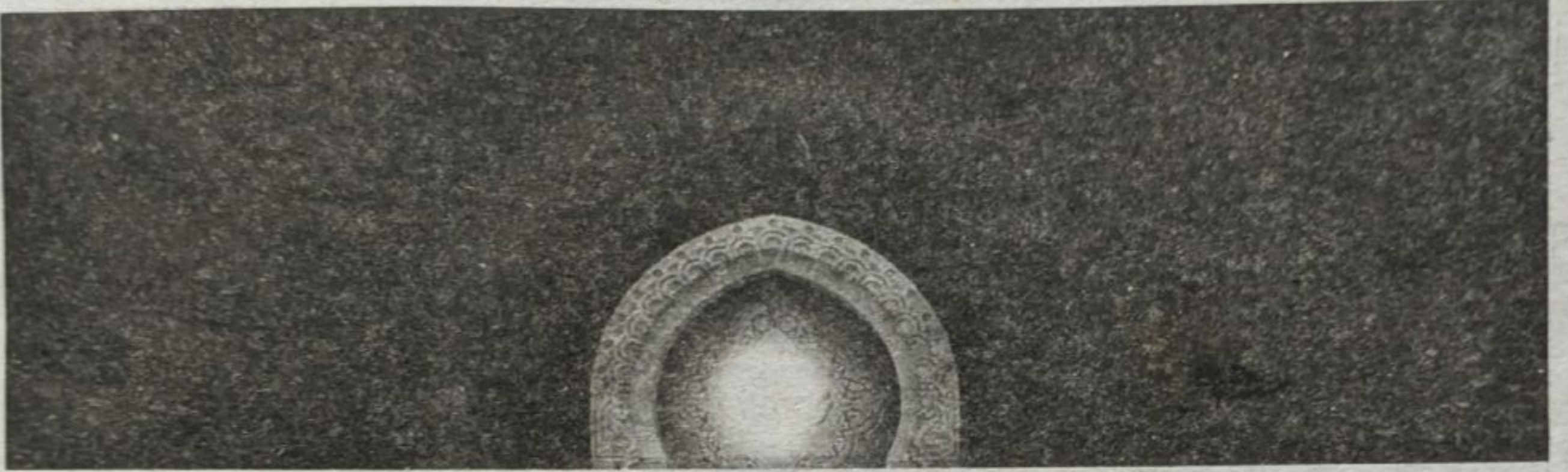
—তারেক মেহান্না

বুধবার, ৪ সফর ১৪৩৩

প্রাইমাউথ কারেকশনাল ফ্যাসিলিটি
আইসোলেশন ইউনিট- সেল# ১০৭।

ইসলামে গোপনীয়তার বিধান

শাইখ আবু সাদ ইবনু আদিল্লাহ



গত সংখ্যার পর

প্রথমত : শত্রুদের উপর মিথ্যারোপ
আমরা এ কথা বলছি না যে, শুধুমাত্র
যুদ্ধের ভিতরই মিথ্যার ব্যবহার বৈধ।
কারণ, যুদ্ধ ও যুদ্ধভিন্ন উভয় অবস্থায়ই
শত্রুর উপর মিথ্যার ব্যবহার বৈধ, তা
আমরা দলিল সহকারে উপস্থাপন করব
ইনশাআল্লাহ।

ক) যুদ্ধাবস্থায়

عَنْ أَشْعَاءِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَضْلُحُ الْكَذِبُ إِلَّا
فِي ثَلَاثٍ: كَذِبُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ لِرِضَايَها، أَوْ
إِضْلَاحُ بَيْنِ النَّاسِ، أَوْ كَذِبٌ فِي الْحَرْبِ.

অর্থ: আসমা বিনতে ইয়াযিদ
(রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত।
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তিন
অবস্থায় মিথ্যা বলা জায়েয। সেগুলো
হলো—

১. স্ত্রীকে খুশি করার জন্য মিথ্যা বলা।
২. মানুষের মাঝে সংশোধনীর জন্য।
৩. যুদ্ধক্ষেত্রে মিথ্যা বলা। [মুসনাদে
আহমাদ: ২৭৬০৮, ইবনে আবি
শাইবা: ২৬৫৬৫]

ইমাম নববী (রহ.) এর ব্যাখ্যা :

وقد صرح في الحديث جواز الكذب في ثلاثة

أشياء أحدها في الحرب. قال الطبري: إنما
يجوز من الكذب في الحرب المعاريض دون
حقيقة الكذب فإنه لا يحل. هذا كلامه
والظاهر إباحة حقيقة نفس الكذب لكن
الاعتصار على التعريض أفضل والله أعلم

অর্থ: তিন ক্ষেত্রে মিথ্যার ব্যবহার
হাদীস থেকে সঠিক বলে প্রমাণিত
হচ্ছে। তার একটি হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্রে।
ইমাম তাবারী (রহ.) বলেছেন,
'প্রতিপক্ষ যুদ্ধে শুধু মিথ্যা ব্যবহার বৈধ
তবে বাস্তবিক মিথ্যা বাদে। কারণ, তা
হালাল নয়।'

এটা তার ব্যক্তিগত মন্তব্য, হাদীস
থেকে দৃশ্যমান যে, প্রকাশ্য বাস্তব
মিথ্যাও বৈধ। কিন্তু আকার-ইঙ্গিতে
সীমাবদ্ধ রাখাই উত্তম। এ সম্পর্কে
আল্লাহই ভাল জানেন। [শারহে
মুসলিম, খন্ড- ১২, পৃ: ৪৫; তুহফাতুল
আহওয়াযী, ৫/২৬২]

ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) এর
ব্যাখ্যা :

قال بن العربي: الكذب في الحرب من
المستثنى الجائز بالنص رفقا بالمسلمين لحاجتهم
إليه وليس للعقل فيه مجال ولو كان تحريم
الكذب بالعقل ما انقلب حلالا انتهى

ইবনুল আরাবী (রহ.) মন্তব্য করেছেন
যে, যুদ্ধ ক্ষেত্রে মিথ্যা ব্যবহার একটি
ব্যতিক্রম বৈধ যা দলিলাদি দ্বারা
প্রমাণিত। মুসলিমদের প্রয়োজনে
তাদের প্রতি (আল্লাহর পক্ষ থেকে তা)
সহানুভূতি স্বরূপ। যাতে আকলের
কোন স্থান নেই। যদি আকল অনুপাতে
মিথ্যা হারাম হতো তবে এটা হালাল
হতো না। [ফাতহুল বারী, ৬/ ১৫৯;
নাইলুল আওতার, ১৪/ ১১৩,
তুহফাতুল আহওয়াযী, ৫/ ২৬২]

খ) যুদ্ধ ছাড়াও শত্রুর উপর মিথ্যা
ব্যবহার জায়েয

তা কয়েকটি কারণে বৈধ হতে পারে।
যাতে মুমিনের জন্য দীনি ও দুনিয়াবি
কল্যাণ রয়েছে অথবা যাতে কাফিরদের
চক্রান্ত এড়িয়ে যাওয়া যায়। দলিলাদি
নিম্নরূপ:

১) ইব্রাহীম (আ.) এর ঘটনা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمْ يَكْذِبْ
إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ ثِنْتَيْنِ
مِنْهُنَّ فِي ذَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَوْلُهُ (إِنِّي سَقِيمٌ)
وَقَوْلُهُ (بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا) وَقَالَ بَيْنَا هُوَ
ذَاتَ يَوْمٍ وَسَارَةُ إِذْ أَتَى عَلَى جَبَّارٍ مِنَ الْجَبَّارَةِ

فَقِيلَ لَهُ إِنَّ هَٰذَا رَجُلًا مِّنْهُمُ امْرَأَةٌ مِّنْ أَحْسَنِ النَّاسِ فَأَرْسَلْ إِلَيْهِ فَمَسَّاهُ عَنْهَا فَقَالَ مَنِ هَٰذَا قَالَ أُخْتِي فَأَتَى سَارَةَ قَالَتْ يَا سَارَةُ لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِي وَغَيْرِكَ وَإِنْ هَٰذَا سَأَلَنِي فَأَخْبِرْتُهُ أَنَّكَ أُخْتِي فَلَا تُكَذِّبْنِي

অর্থ: ইব্রাহীম (আ.) তিনটা মিথ্যা ছাড়া আর কোন মিথ্যা বলেননি। তার মধ্যে দুইটা আল্লাহর জন্য। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, (পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ইব্রাহীম (আ.) এর ঘটনা বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, ইব্রাহীম তাঁর জাতিকে বললেন-)

إِنِّي سَقِيمٌ
আমি অসুস্থ। [৩৭: ৮৯]

অপর এক জায়গায় (ইব্রাহীম (আ.) এর ঘটনা বলতে গিয়ে) আল্লাহ তাআলা বলেন,

بَلْ فَعَلَهُ كَيْدُكُمْ هَٰذَا فَاسْأَلُوهُمْ

বরং এটাতো তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বড় সেই করেছে। [২১: ৬৩]

তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, একদা ইব্রাহীম (আ.) এবং তার স্ত্রী সারা অত্যাচারী শাসকদের কোনো এক শাসকের এলাকায় পৌঁছলেন, তখন ঐ অত্যাচারী শাসককে খবর দেওয়া হলো যে, এ এলাকায় জনৈক ব্যক্তি এসেছে। তার সাথে একজন পরমা সুন্দরী মেয়ে আছে। তখন সে তাঁর নিকট লোক পাঠাল। সে তাঁকে নারীটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। এ নারীটি কে? তিনি উত্তর দিলেন, মেয়েটি আমার বোন।

অতঃপর তিনি সারার নিকট আসলেন এবং বললেন, সারা! তুমি আর আমি ব্যতীত পৃথিবীর উপর আর কোনো মুমিন নেই। এ লোকটি আমাকে তোমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল। তখন আমি তাকে জানিয়েছি যে, তুমি আমার বোন। কাজেই তুমি আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করো না...। [সহীহ বুখারী: ৩৩৫৮, আহমাদ: ৯২৪১, ইবনে হিব্বান: ৫৭৩৭]

وإلا فالكذب المحض في مثل تلك المقامات يجوز وقد يجب لتحمل أخف الضررين دفعا لأعظمهما وأما تسميته إياها كذبات فلا يريد أنها تدم فإن الكذب وإن كان قبيحا محلا لكنه قد يحسن في مواضع وهذا منها قوله

২২ | জানুয়ারি '১৬

একদা ইব্রাহীম (আ.) এবং তার স্ত্রী সারা অত্যাচারী শাসকদের কোনো এক শাসকের এলাকায় পৌঁছলেন, তখন ঐ অত্যাচারী শাসককে খবর দেওয়া হলো যে, এ এলাকায় জনৈক ব্যক্তি এসেছে। তার সাথে একজন পরমা সুন্দরী মেয়ে আছে। তখন সে তাঁর নিকট লোক পাঠাল। সে তাঁকে নারীটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। এ নারীটি কে? তিনি উত্তর দিলেন, মেয়েটি আমার বোন।

অতঃপর তিনি সারার নিকট আসলেন এবং বললেন, সারা! তুমি আর আমি ব্যতীত পৃথিবীর উপর আর কোনো মুমিন নেই। এ লোকটি আমাকে তোমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল। তখন আমি তাকে জানিয়েছি যে, তুমি আমার বোন। কাজেই তুমি আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করো না...। [সহীহ বুখারী: ৩৩৫৮, আহমাদ: ৯২৪১, ইবনে হিব্বান: ৫৭৩৭]

ثنتين منهن في ذات الله خصهما بذلك لأن قصة سارة وإن كانت أيضا في ذات الله لكن تضمنت حظا لنفسه ونفعا له بخلاف الثنتين الأخيرتين فإنهما في ذات الله محضا وقد وقع في رواية هشام بن حسان المذكورة أن إبراهيم لم يكذب قط إلا ثلاث كذبات كل ذلك في ذات الله وفي حديث بن عباس عند أحمد والله إن جادل بين الا عن دين الله

অর্থ: এই সকল অবস্থার প্রেক্ষিতে স্পষ্ট মিথ্যা ব্যবহার করা বৈধ। কোনো ক্ষেত্রে দুই ক্ষতিকর অবস্থায়

অপেক্ষাকৃত বেশি ক্ষতিকে প্রতিহত করণের লক্ষ্যে কম ক্ষতিকর অবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক। আর তাকে মিথ্যা হিসেবে নামকরণের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সা.) তা নিন্দনীয় বলে উদ্দেশ্য করেননি, যদিও তা বাহ্যত নিন্দনীয় ক্ষতিকর মনে করা হয়। কিন্তু যে সমস্ত জায়গায় তা উত্তম বলে বিবেচিত এই উল্লেখিত অবস্থা তার অন্তর্ভুক্ত।

এখানে নবী (সা.) “দুটি ঘটনা আল্লাহর ব্যাপারে” বলে ঘটনাদ্বয়কে নির্দিষ্ট করেছেন। আর ইব্রাহীম (আ.) এর স্ত্রী সারার ঘটনাও আল্লাহর দীনের খাতিরে ছিল। কিন্তু এটি ইব্রাহীম (আ.) এর ব্যক্তিগত ও তার নিজ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় ছিল। যা বাকি ঘটনাদ্বয়ের বিপরীত, কারণ উপরোক্ত ঘটনাদ্বয় শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য ছিল। আর হিশাম ইবনে হাস্‌সান কর্তৃক বর্ণনায় এসেছে-

إن إبراهيم لم يكذب قط إلا ثلاث كذبات كل ذلك في ذات الله

অর্থ: ইব্রাহীম (আ.) তিন স্থান ছাড়া কখনও কোনো মিথ্যা কথা বলেননি। (আর) ঐ সবগুলোই ছিল আল্লাহ তাআলার খাতিরে।

ইমাম আহমাদ (রহ.) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এর হাদীস বর্ণনা করেন যে,

والله إن جادل بين الا عن دين الله

অর্থ: আল্লাহর শপথ! তিনি একমাত্র আল্লাহর দীনের কারণেই উপরোক্ত তিন ক্ষেত্রে মিথ্যা বলেছিলেন। [ফাতহুল বারী, ৬/ ৩৯২]

তাই দীনি স্বার্থ রক্ষা ও কাফিরদের অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষা উভয় ক্ষেত্রেই মিথ্যার ব্যবহার বৈধ।

২) আসহাবে উখদুদের ঘটনা

عَنْ صُهَيْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « كَانَ مَلِكٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ. فَلَمَّا كَبُرَ قَالَ لِلْمَلِكِ إِنِّي قَدْ كَبُرْتُ فَأَبْعَثْ إِلَيَّ غُلَامًا أَغْنِيَهُ السِّخْرَ. فَبَعَثَ إِلَيْهِ غُلَامًا يُعَلِّمُهُ فَكَانَ فِي طَرِيقِهِ إِذَا سَلَكَ رَاهِبٌ فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلِمَةً فَأَعْجَبَهُ فَكَانَ إِذَا أَى السَّاحِرَ مَرَّ بِالرَّاهِبِ وَقَعَدَ إِلَيْهِ فَيَأْذَا أَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى الرَّاهِبِ فَقَالَ

إِذَا خَشِيتُ السَّاجِرَ قُتِلَ خَبَسَنِي أَهْلِي. وَإِذَا
خَشِيتُ أَهْلَكَ قُتِلَ خَبَسَنِي السَّاجِرُ.

সুহাইব (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ বলেছেন, তোমাদের পূর্বে এক শাসক ছিল, তার ছিল এক যাদুকর। যখন যাদুকর বৃদ্ধ হয়ে গেল তখন সে রাজাকে বলল, 'আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি। তাই আপনি একজন বালককে পাঠিয়ে দিন যাতে করে আমি আমার যাদু তাকে শেখাতে পারি।' অতএব সে (রাজা) তার কাছে একটি বালক পাঠাল, যাতে তাকে যাদু শিখাতে পারে।

ঐ বালক যখন (যাদু শিখতে) যেত তখন তার (চলার) পথে এক রাহেব (আলেম) থাকত। বালকটি পাদ্রীর নিকট বসে। তার কথা শুনে খুব ভাল লাগে। তাই যখনই বালকটি যাদুকরের নিকট যেত পশ্চিমধ্যে পাদ্রীর সাথে দেখা করতো এবং তার কাছে বসতো। (একদিন) যাদুকরের নিকট আসলে যাদুকর তাকে দেবির জন্য প্রহার করে, ফলে বালকটি সেই ব্যাপারে রাহেবের নিকট অভিযোগ করে, রাহেব তাকে উত্তর দিলো- "যখন তুমি যাদুকরকে ভয় পাবে তখন তাকে বলো যে, আমার পরিবার আমাকে আটকে রেখেছিল। আর যদি তুমি তোমার পরিবারকে ভয় পাও তবে তুমি বলবে যে, আমাকে যাদুকর আটকে রেখেছিল..."। [সহীহ মুসলিম: ৭৭০৩, সহীহ ইবনে হিব্বান: ৮৭৩]

ইমাম নববী (রহ.) এর ব্যাখ্যা :

وفيه جواز الكذب في الحرب ونحوها وفي
انقاذ النفس من الهلاك سواء نفسه أو نفس
غيره ممن له حرمة

অর্থ: এই হাদীসে যুদ্ধে এবং অনুরূপ অন্যান্য বিষয়েও মিথ্যার বৈধতা দেয়া হয়েছে। হোক সেটা ধ্বংসের হাত থেকে আত্মরক্ষার্থে অথবা এমন কাউকে বাঁচাতে, যাকে ইসলাম সম্মানিত করেছে। [শরহে মুসলিম, ১৮/ ১৩০]

এখানে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, এটি যুদ্ধভিন্ন অবস্থা ছিল। এরপরও ইমাম নববী (রহ.) যেকোনো ইঙ্গিত করেছেন তা হলো, যখন যুদ্ধভিন্ন অবস্থায়ই কাফিরদের সাথে মিথ্যার বৈধতা আছে তখন যুদ্ধাবস্থায় তো এটা আরও অধিক

যথায়। পূর্বে উল্লেখিত হাদীস ও নবী ইব্রাহীম (আ.) এর হাদীসদ্বয়ে কাফিরদের পাকড়াও (বা অত্যাচার) থেকে আত্মরক্ষার জন্য মিথ্যার বৈধতা পাওয়া যায়।

ইমাম নববী অন্য স্থানে বলেছেন,

قالوا: ولا خلاف أنه لو قصد ظالم قتل رجل
هو عنده مخفف وجب عليه الكذب في أنه
لا يعلم أين هو

অর্থ: আলেমগণ বলেছেন, কোনো অত্যাচারী ব্যক্তি যদি কোনো (নিরীহ)

কোনো অত্যাচারী ব্যক্তি
যদি কোনো (নিরীহ)

ব্যক্তিকে হত্যা করতে চায়,
আর এমতাবস্থায় ঐ
মাযলুম ব্যক্তি আত্মগোপন
করে আছে। তবে

এমতাবস্থায় ঐ যালিমের
উপর মিথ্যার ব্যবহার
ওয়াজিব যে, সে কোথায়
আছে তা সে অবগত নয়,
আর এক্ষেত্রে কোনো
মতবিরোধ নেই। [শারহে

মুসলিম, ১৬/১৫৮,
তুহফাতুল আহওয়ায়ী,
৬/৫৮, আওনুল ওদূদ,
১/২৬৮]

দৈনন্দিন স্বার্থেও কাফিরের
সাথে মিথ্যা বলা বৈধ।

ইবনু হাজার (রহ.) তার
গ্রন্থে সহীহুল বুখারীর
'যুদ্ধক্ষেত্রে মিথ্যার ব্যবহার'
নামক অধ্যায়ে বিশ্লেষণ
করতে গিয়ে হাজ্জাজ ইবনে
ইলাতের ঘটনা ইঙ্গিত
করেছেন।

ব্যক্তিকে হত্যা করতে চায়, আর এমতাবস্থায় ঐ মাযলুম ব্যক্তি আত্মগোপন করে আছে। তবে এমতাবস্থায় ঐ যালিমের উপর মিথ্যার ব্যবহার ওয়াজিব যে, সে কোথায় আছে তা সে অবগত নয়, আর এক্ষেত্রে কোনো মতবিরোধ নেই। [শারহে মুসলিম, ১৬/১৫৮, তুহফাতুল আহওয়ায়ী, ৬/৫৮, আওনুল ওদূদ, ১/২৬৮]

দৈনন্দিন স্বার্থেও কাফিরের সাথে মিথ্যা বলা বৈধ। ইবনু হাজার (রহ.) তার গ্রন্থে সহীহুল বুখারীর 'যুদ্ধক্ষেত্রে মিথ্যার ব্যবহার' নামক অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে হাজ্জাজ ইবনে ইলাতের ঘটনা ইঙ্গিত করেছেন।

(ويقويه ما أخرجه أحمد وابن حبان من
حديث أنس في قصة الحجاج بن علاط الذي
أخرجه النسائي وصححه الحاكم في استثنائه
النبي صلى الله عليه وسلم، وإخباره لأهل
مكة أن أهل خيبر هزموا المسلمين وغير
ذلك ما هو مشهور فيه)... إلى أن قال: (قصة
الحجاج بن علاط أيضا لم تكن في حالة
حرب)

অর্থ: আর এই মতটিকে শক্তিশালী করে যা আনাস (রা.) এর সূত্রে ইমাম আহমাদ ও হিব্বান (রহ.) হাজ্জাজ ইবনে ইলাতের ঘটনা বর্ণনা করেছেন, যেটা ইমাম নাসাঈও বর্ণনা করেছেন, আর ইমাম হাকিম এটাকে সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন, সে (হাজ্জাজ ইবনে ইলাত) আল্লাহর নবীর নিকট অনুমতি প্রার্থনা করে মক্কাবাসীর মধ্যে এই সংবাদ প্রচার করার জন্য যে, খায়বারবাসীরা মুসলমানদের পরাজিত করেছে ইত্যাদি ইত্যাদি (যে ঘটনা খ্যাত হয়ে আছে)... তিনি শেষ পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন, হাজ্জাজ ইবনে ইলাতের ঘটনাও যুদ্ধ ছাড়া অবস্থায় ছিল। [ফাতহুল বারী, ৬/১৫৯; নাইলুল আওতার, ১৪/১১২]

ইমাম ইবনু কাসীর (রহ.) তার "আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া" গ্রন্থে এ সম্পর্কে সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন। [দেখুন- ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ২১৫]

চলবে ইনশা আল্লাহ...



কারাগারের ভয় আমার নেই কিন্তু কবরে যাবার ইচ্ছাও আমার নেই

বান্দা রেজা

পুরান ঢাকায় কেন্দ্রীয় কারাগারের দেয়াল ঘেঁষে বহুবার চলে গিয়েছি। কখনও বা চকবাজারের ঐতিহ্যবাহী জ্যামে আটকে থেকেছি আর উচু প্রাচীরের অন্যপাশের মানুষগুলোর জীবন নিয়ে কৌতুহল দেখিয়েছি। কিন্তু যখন আমি নিজে ওই ভুবনের বাসিন্দা হয়েছি তখন সত্যিকারভাবে উপলব্ধি করেছি কীভাবে একটা মানুষের জীবন একটা চার দেয়ালের মাঝে স্থির হয়ে যায়। কীভাবে সেকেন্ডের কাঁটা মিনিটে রূপান্তরিত হয় আর মিনিটের কাঁটা ঘন্টায়। কীভাবে একটা সামান্য দেয়াল মানুষকে তার এতদিনের ভোগ করা স্বাধীনতার মূল্য অনুধাবন করায়। রিক্সার টুংটাং আওয়াজ আর বাদামওয়ালা “বাদাম! বাদাম!”

হাঁকেও যে এতটা মধু আছে তা জেলখানার এই উচু দেয়ালই আমাকে প্রথম অনুভব করিয়েছে।

জীবনে বহুবার আমার পাশ দিয়ে প্রিজেন ভ্যানকে যেতে দেখেছি এবং ভ্যানের ছোট জানালা দিয়ে উৎসুক চোখগুলো দেখে তাদের জন্য ইনসাফের দুআ করেছি। কিন্তু আমি নিজে যখন ওই ভ্যানের সাওয়ারি হয়েছি এবং নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয় এরকম ঠাসাঠাসি ভিড়ে ঘন্টার পর ঘন্টা আটকে থেকেছি। মাঘ মাসের শৈত্যপ্রবাহের শীতেও দরদর করে ঘেমে শরীরের পোশাক চুবাচুবা করে ভিজিয়েছি। তখন সত্যিকারভাবে বুঝতে পেরেছি, ‘মানবাধিকার’ একটি

কাল্পনিক শব্দমাত্র। একে শুধু অভিধান আর নেতা-নেত্রীদের ভাষণেই পাওয়া যায়। বাস্তবে এর কোনোই অস্তিত্ব নেই। ভেবে বিস্মিত হয়েছি কেন আমাদের দেশে ২০ জনের ধারণক্ষমতাসম্পন্ন প্রিজেন ভ্যানে ৫০ জনকে ঠেসে ঢুকানো হয় আর আমাদেরও তথাকথিত মানবাধিকার কর্মীরা তা দেখেও না দেখার ভান করেন।

জেল কাউকে একদম ভেঙে ফেলে আবার কাউকে আরও ময়বুত করে গড়ে তোলে। আলহামদুলিল্লাহ, জেল আমাকে ভাঙতে পারেনি বরং নতুন এক উদ্যম দান করেছে। এই জেলখানাই আমাকে সাইয়িদিনা

জেলের পুরো সময়টাই আমি দুটি পাখার ঘোরে আচ্ছন্ন ছিলাম। বারবার আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করেছি, যেন তিনি আমাকে তার দুশমনের শৃঙ্খল থেকে নিরাপদ রাখেন কিন্তু তাদের বুলেট থেকে বঞ্চিত না করেন। এই দুনিয়াতে যেমন আছি ভালই আছি কিন্তু জান্নাতে যেন তিনি দয়া করে আমাকে দুটি মস্ত বড় পাখা দান করেন। আমি এই বেহায়া পাখিগুলোর ওপর কিছুটা প্রতিশোধ নিতে চাই।

আমি অনেক ভাইকে দেখেছি জেলের ভয়ে জড়সড়। এরা দুনিয়ার সামান্য আরাম-আয়েশ হারানোর ভয়ে আর জেল-হাজত এড়ানোর জন্য জেনে বুঝে আল্লাহপ্রদত্ত হক থেকে চোখ লুকিয়ে বেড়ায়। কেউ কেউ এমনকি আল্লাহর হুকুম লুকাতে মিথ্যার আশ্রয় নিতে পর্যন্ত কিছুমাত্র দ্বিধা করছে না। ভাই একটু চোখ খুলে দেখুন। যে কারাগারকে আপনি এত ভয় পাচ্ছেন তা আসলে কিছুই না। প্রকৃত ভয়ের জায়গা হচ্ছে কবর যা এড়ানোর কোনো ব্যবস্থাই হয়তো আপনি নিচ্ছেন না।

ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) এর বন্দিদশার অনুভূতি শিক্ষা দিয়েছে যা কোনো কিতাব আমাকে কখনই দিতে পারেনি। এই জেল আমাকে বোন আফিয়া সিদ্দিকার কষ্ট যতটা হৃদয়ঙ্গম করিয়েছে তা কোনো মিডিয়া কখনও পারেনি।

দীর্ঘ প্রায় এক বছর অন্যায়ভাবে কারাবন্দি জীবন কাটিয়েছি। মানুষ হিসেবে যখনই কিছুটা কষ্ট হয়েছে তখনই ইউসুফ (আ.) এবং আফিয়া সিদ্দিকার ঘটনা আমাকে অনুপ্রেরণা জুগিয়ে নতুন শক্তি দিয়েছে। আমার সেলের একদিকের দেয়ালে বড় করে লিখে রেখেছিলাম, These are the best days of my life.

মানুষ অবাক হতো। কিন্তু আমাকে দেখে আমার লেখা বিশ্বাসও করত। শুধু এই লেখাটা দেখার জন্যই অনেকে আমাদের তালিমের হালাকায় ভিড় জমাত আর অদ্ভুত এক স্বপ্নদৃষ্টি নিয়ে লেখাটার দিকে তাকিয়ে থাকত।

প্রায় প্রতিটা দিন আমি মুক্ত আকাশে ভেসে বেড়ানো পাখিদের দিকে তাকিয়ে তাদের প্রতি ঈর্ষা প্রকাশ করেছি আর গুনগুন করে তিলাওয়াত করেছি-

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يَفْتَكِرُونَ إِلَّا الرِّحْمَانُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ

অর্থ: তারা কি লক্ষ্য করে না, তাদের মাথার উপর পাখা বিস্তারকারী ও পাখা সংকোচনকারী উড়ন্ত পক্ষীকুলের প্রতি? দয়াময় আল্লাহই তাদেরকে স্থির রাখেন। তিনি সর্ব বিষয় দেখেন। [কুরআন, ৬৭: ১৯]

জেলের পুরো সময়টাই আমি দুটি পাখার ঘোরে আচ্ছন্ন ছিলাম। বারবার আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করেছি, যেন তিনি আমাকে তার দুশমনের শৃঙ্খল থেকে নিরাপদ রাখেন কিন্তু তাদের বুলেট থেকে বঞ্চিত না করেন। এই দুনিয়াতে যেমন আছি ভালই আছি কিন্তু জান্নাতে যেন তিনি দয়া করে

আমাকে দুটি মস্ত বড় পাখা দান করেন। আমি এই বেহায়া পাখিগুলোর ওপর কিছুটা প্রতিশোধ নিতে চাই।

আমি অনেক ভাইকে দেখেছি জেলের ভয়ে জড়সড়। এরা দুনিয়ার সামান্য আরাম-আয়েশ হারানোর ভয়ে আর জেল-হাজত এড়ানোর জন্য জেনে বুঝে আল্লাহপ্রদত্ত হক থেকে চোখ লুকিয়ে বেড়ায়। কেউ কেউ এমনকি আল্লাহর হুকুম লুকাতে মিথ্যার আশ্রয় নিতে পর্যন্ত কিছুমাত্র দ্বিধা করছে না। ভাই একটু চোখ খুলে দেখুন। যে কারাগারকে আপনি এত ভয় পাচ্ছেন তা আসলে কিছুই না। প্রকৃত ভয়ের জায়গা হচ্ছে কবর যা এড়ানোর কোনো ব্যবস্থাই হয়তো আপনি নিচ্ছেন না।

জেল থেকে বের হবার পর আমি যতবারই কবরস্থানের পাশ দিয়ে গিয়েছি ততবারই কবরের দিকে তাকিয়ে বলেছি, “হায় কবর! হায় কবর! নিশ্চয়ই তুমি অতি কঠিন ঠিকানা। বন্দিত্বের পূর্বে যেমন স্বাধীনতা কী জিনিস আমি বুঝিনি, মৃত্যুর পূর্বেও তেমনই হায়াতের মর্মও বুঝতে পারছি না। কারাগারের ভয় আমার নেই কিন্তু কবরে যাবার ইচ্ছাও আমার নেই।”

ইয়া আল্লাহ! ইয়া মা'বুদ! আমি মৃত্যু চাই না, হায়াত চাই। কবর চাই না, সবুজ পাখির সিনা চাই। একজোড়া পাখা চাই। আপনার রিদা চাই আর দিদার চাই। ইয়া আল্লাহ আমি সত্যিকারের রেজাউল কাবির হতে চাই। বান্দা রেজা হতে চাই। আপনি আমাকে মৃত্যু থেকে হিফায়ত করুন। কবর থেকে দূরে রাখুন। একটা বুলেট আমার জন্য মঞ্জুর করুন, যা আমার সিনাকে ভেদ করে যাবে। আমাকে শাহাদাত দান করুন। আমাকে কবুল করুন। আমীন, ইয়া রব্বাল আলামীন।



হায়দ্রাবাদ গণহত্যা ভারতে মুসলিম নিধনের চেপে রাখা অধ্যায়

ইবনু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আদিল

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ক্লান্ত বৃটেন সিদ্ধান্ত নিলো তারা ভারত উপমহাদেশের শাসনভার ছেড়ে দেবে। সরাসরি বৃটিশ শাসিত প্রদেশগুলোর কেউ পাকিস্তানে গেল, আর কেউ ভারতের সঙ্গে রইল। এছাড়াও ভারতে অনেকগুলো রাজ্য ছিল যেগুলো বৃটিশদের দ্বারা নয় বরং অনেকটা স্বাধীন রাজা দ্বারা শাসিত হত (উদাহরণস্বরূপ কাশ্মীর, যা হিন্দু মহারাজা হরি সিং কর্তৃক শাসিত হত)। এ সকল রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে ধনী ও শক্তিশালী ছিল হায়দ্রাবাদ রাজ্য। হায়দ্রাবাদের নিজস্ব সেনাবাহিনী, এয়ারলাইন্স, কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও মুদ্রা ছিল। ছিল আভ্যন্তরীণ রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা। জনসংখ্যা ছিল দেড় কোটিরও বেশি। আর আয়তন বাংলাদেশের দেড়গুণ। হায়দ্রাবাদের তৎকালীন নিয়াম-উল-মুলক উসমান আলি খান ছিলেন সে সময়ে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি।

ভারত বিভাগের সময় বৃটিশ সরকার কাশ্মীর, হায়দ্রাবাদসহ সকল স্বাধীন রাজ্যকে তিনটির মধ্যে যেকোন একটি বেছে নিতে বলেছিল; হয় ভারতের সাথে একীভূত হওয়া, কিংবা পাকিস্তানের সাথে নতুবা দুটোর বাইরে স্বাধীন থাকা। নিয়াম উসমান আলি খান শেষেরটি বেছে নিলেন। ভারতের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ প্রমাদ গুনলো। ভারতের ঠিক মধ্যখানে একটি স্বাধীন মুসলিম শাসনাধীন রাজ্য তাদের কাছে দুঃস্বপ্নের মত মনে হলো। শাসকের আসনে মুসলিমরা থাকলেও হায়দ্রাবাদের মোট জনসংখ্যার ৮৫% ছিল হিন্দু। হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতারা তাই হায়দ্রাবাদ দখল করতে মাঠে নেমে পড়লেন।

শুরু হলো যুদ্ধ :

উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদী দলগুলোর ইন্ধনে হায়দ্রাবাদের অভ্যন্তরে কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে মুসলিম জমিদার ও উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের

গণহত্যা শুরু হয়। এক হিসাব মতে প্রায় দুই হাজার মুসলিম তাদের হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়। এ পরিস্থিতিতে নিয়াম স্থানীয় যুবকদের নিয়ে গঠিত রাজাকারদের (বাংলায় যার অর্থ হয় স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী) দায়িত্ব দেন হত্যাকাণ্ড প্রতিরোধের। রাজাকারেরা কমিউনিস্টদের পাকড়াও অভিযান শুরু করে, অভিযুক্তদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। কমিউনিস্টরা সবাই ছিল হিন্দু, সুতরাং এ সুযোগকে কাজে লাগাল ভারত সরকার। বহুল প্রতীক্ষিত হায়দ্রাবাদ দখলের অজুহাত এখন তাদের হাতে। তারা প্রচার করলো উগ্র মুসলিম রাজাকারেরা পাইকারি হারে হিন্দুদের হত্যা করেছে। ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ সালে 'অপারেশন পোলো' সাংকেতিক নামে ভারতীয় সেনাবাহিনী চারদিক থেকে হায়দ্রাবাদ আক্রমণ শুরু করে। বিশ্বের কেউ সেদিন হায়দ্রাবাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেনি। লক্ষাধিক ভারতীয় সৈন্যের বিপরীতে হায়দ্রাবাদের ট্রেনিংপ্রাপ্ত প্রফেশনাল সৈন্যের সংখ্যা ছিল মাত্র ছয় হাজার, তাদের সাথে ছিল আর বিশ হাজার রাজাকার বাহিনী। এ অসম লড়াইয়ে চারদিন প্রতিরোধ করে অবশেষে পরাজয় মানে হায়দ্রাবাদ বাহিনী। ১৭ সেপ্টেম্বর সকালে সিকান্দারাবাদে ভারতীয় মেজর জেনারেল জয়ন্ত নাথ চৌধুরীর নিকট আত্মসমর্পণ করেন হায়দ্রাবাদের সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল সাইয়েদ আহমেদ এল এদরুস। স্বাধীনতা হারিয়ে হায়দ্রাবাদ ভারতের একটি প্রদেশে পরিণত হয়।

স্বাদ মেটেনি রাষ্ট্রসদের :

হায়দ্রাবাদ দখলের পরপরই গণহত্যার খবর আসতে থাকে। আবার ভারতজুড়ে মুসলিমদের গণঅসন্তোষের ভয়ে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু কংগ্রেসের সংসদ সদস্য পণ্ডিত সুন্দরলালের নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন যাতে হিন্দু-মুসলিম উভয় ধর্মেরই সদস্য ছিল। এ কমিটি হায়দ্রাবাদ ঘুরে এসে তাদের রিপোর্ট জমা দেয় যা 'সুন্দরলাল রিপোর্ট' নামে পরিচিত। নেহেরু থেকে শুরু করে

সেনাবাহিনী মুসলিমদের পুরোপুরি নিরস্ত্র করলেও হিন্দুদের তো নিরস্ত্র করা হয়ইনি বরং সেনাবাহিনী উৎসাহিত করেছে আর কিছু ক্ষেত্রে বাধ্য করেছে স্থানীয় হিন্দুদের, মুসলিমদের বাড়িঘর ও দোকানপাট লুটপাট করার জন্য। সুন্দরলাল রিপোর্টের সাথে পেশ করা একটা গোপনীয় নোটে হিন্দুদের রক্তলোলুপ এই চরিত্রের এক জঘন্য নমুনা দেখা যায়।

মনমোহন পর্যন্ত, ভারত সরকার এ রিপোর্ট সম্পর্কে গোপনীয়তা বজায় রেখেছে। গণহত্যার বিষয়ে বহির্বিষয় ও ভারতের জনগণকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাখা হয়। সর্বশেষে ২০১৩ সালে দিল্লির নেহেরু স্মৃতি জাদুঘরে এ রিপোর্ট জনসম্মুখে আসে। কমিটির মতে, খুব কম করে ধরলেও ২৭০০০ থেকে ৪০,০০০ মুসলমান নিহত হয়েছিলেন। যদিও এ.জি নুরানি ও অন্যান্য গবেষকদের মতে এ সংখ্যা দুই লাখ বা তার চেয়েও বেশি। কমিটির রিপোর্টে দেখা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভারতীয় সেনাবাহিনী এ সকল গণহত্যায় সরাসরি জড়িত ছিল।

“বেশ কয়েক জায়গায়, সামরিক বাহিনীর সদস্যরা শহর ও গ্রাম থেকে মুসলিম পুরুষদের ধরে নিয়ে এনে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করেছে।”

সেনাবাহিনী মুসলিমদের পুরোপুরি নিরস্ত্র করলেও হিন্দুদের তো নিরস্ত্র করা হয়ইনি বরং সেনাবাহিনী উৎসাহিত করেছে আর কিছু ক্ষেত্রে বাধ্য করেছে স্থানীয় হিন্দুদের, মুসলিমদের বাড়িঘর ও দোকানপাট লুটপাট করার জন্য। সুন্দরলাল রিপোর্টের সাথে পেশ করা একটা গোপনীয় নোটে হিন্দুদের রক্তলোলুপ এই চরিত্রের এক জঘন্য নমুনা দেখা যায়।

“অনেক জায়গায় আমাদের দেখানো হয় কুয়া যেগুলো ছিল পঁচা লাশে ভরা।

এ রকম এক ক্ষেত্রে আমরা ১১টি লাশ দেখেছি যার মধ্যে ছিল একজন মহিলা যার ছোট শিশুটি তার স্তনের সাথে লেগেছিল।”

“দেখেছি ডোবা-নালার মধ্যে লাশ ছড়িয়ে আছে। বেশ কয়েক জায়গায় দেহ পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল; আমরা গিয়ে দেখেছি পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়া হাড় আর খুলি এখনও সেখানে পড়ে আছে।”

শুধু হত্যা আর লুটপাটই নয়, অসংখ্য মুসলিম মহিলা সশস্ত্র হিন্দু মিলিশিয়াদের হাতে ধর্ষণের শিকার হয়েছিলেন। মুহাম্মাদ হায়দারের ভাষায়,

“হাজার হাজার পরিবার ভেঙে গিয়েছিল, শিশুরা তাদের পিতামাতার কাছ থেকে আর স্ত্রীরা তাদের স্বামীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। মহিলা ও তরুণীদের ধাওয়া করা হত আর ধর্ষণ করা হত।”

যাদের সামর্থ্য ছিল তারা পাকিস্তানে আশ্রয় নিয়েছিল। জাতিসঙ্ঘ ও মানবাধিকার তখন অন্ধ ছিল। বিশ্বের “সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে” এ অপরাধের জন্য কাউকে শাস্তি পেতে হয়নি, কারো বিচার হয়নি বরং এর দৃশ্যায়ন আবারও ঘটেছিল গুজরাটে।

তথ্যসূত্র :

১

<http://www.hinduonnet.com/thehindu/...>

২

<http://www.bbc.com/news/magazine-24...>

Thomson, Mike (24 September 2013).

“Hyderabad 1948: India's hidden massacre”. BBC

৩- Indian integration of Hyderabad, Wikipedia

৪- Hyderabad state, Wikipedia



ইসলামী জামাআতের কোনো নেতা-কর্মী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য লালায়িত নয়। তবে কোনো দায়িত্ব কারো উপর অর্পিত হলে, সে আমানতদারিতার সাথে তা পালন করে। কিন্তু কেউ কোনো পদ বা দায়িত্ব চেয়ে নিতে পারবে না। যদি কেউ কোনো পদের দাবিদার হয় তাকে তা দেয়া হয় না

জামাআত ও ইতাআত

ড. নাসরুল্লাহ মানসূর

গত সংখ্যার পর-

তৃতীয়ত :

ইসলামী সংগঠন শ্রেণি, গোত্র, বর্ণ বা পেশা দ্বারা তার কর্মীদের মান যাচাই করে না। ঈমান, আমল ও তাকওয়ার ভিত্তিতেই তাদের মর্যাদা দিয়ে থাকে। কে ধনী কে গরিব, কে শিক্ষিত কে অশিক্ষিত, কে উচ্চ বংশের আর কে নীচ বংশের, কে সবল আর কে দুর্বল তা মোটেই বিবেচ্য নয়। ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, কৃষক-শ্রমিক, কামার, কুমার, জেলে, তাঁতী এ সব পেশাও কারও মর্যাদার মানদণ্ড নয়। সবার একটাই পরিচয় তা হলো মুসলিম। এক্ষেত্রে যে অধিক তাকওয়ার অধিকারী তাঁর মান-মর্যাদাও অন্যের নিকট ততবেশি। এ মর্যাদা বা সম্মান কেউ চেয়ে পায় না। বরং আল্লাহ ভীরুতা ও উত্তম চরিত্রই তাকে সকলের নিকট মর্যাদার পাত্র হিসেবে গ্রহণযোগ্য করে তোলে। আল্লাহ তাআলা এ সম্পর্কে ইরশাদ করেন-

إِنْ أُرْسِلْتُمْ إِلَى الْأُمَمَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا
তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই
অধিক মর্যাদা সম্পন্ন, যে তোমাদের
মধ্যে অধিক তাকওয়া সম্পন্ন। নিশ্চয়ই
আল্লাহ মহাজ্ঞানী, সব খবর রাখেন।
[কুরআন, ৪৯: ১৩]

ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, “দুনিয়ার মানুষের কাছে ইজ্জত হচ্ছে

ধন-সম্পদের নাম, আর আল্লাহর কাছে ইজ্জত হচ্ছে পরহেযগারির নাম।”

ধন-সম্পদ বা প্রভাব-প্রতিপত্তির দ্বারা এ সংগঠনের কর্মীদের কোন শ্রেণি বিন্যাস হয় না। বরং ঈমান, আমল ও তাকওয়ার ভিত্তিতেই তা হয়ে থাকে। কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করার কারণে প্রত্যেক কর্মীর মাঝে আমানতদারিতা, সততা, বিশ্বস্ততা তথা উত্তম চারিত্রিক গুণাবলির বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এদের মধ্যে আল্লাহ তাআলার প্রতি অগাধ বিশ্বাস, বিশুদ্ধ আকীদা, দীনি ও দুনিয়াবি জ্ঞান, উত্তম চরিত্র, তাকওয়াবান, আমানতদার প্রভৃতি গুণে যিনি অগ্রণী তাঁকেই নেতা নির্বাচিত করা হয়। যে কেউ ইচ্ছা করলেই এ জামাআতের নেতা নির্বাচিত হতে পারে না। নেতৃত্ব বা দায়িত্ব হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ আমানত। এ আমানত রক্ষায় যথাযথ পদক্ষেপ না নিলে দুনিয়াবি জীবন তো বটেই পরকালীন জীবনেও জবাবদিহিতার মুখোমুখি হতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنْ أُرْسِلْتُمْ إِلَى الْأُمَمَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا
নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তোমাদিগকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দাও। [কুরআন, ৪: ৫৮]

এ আয়াতের আলোচনায় তাফসীরে মাআরেফুল কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে, “রাষ্ট্রীয় যত পদ ও পদমর্যাদা রয়েছে

সে সবই আল্লাহ তাআলার নিকট আমানত। যাদের হাতে নিয়োগ-বরখাস্তের অধিকার রয়েছে সে সমস্ত কর্মকর্তা ও অফিসারবৃন্দ হলেন সে পদের আমানতদার। কাজেই তাদের পক্ষে কোনো পদ এমন কাউকে অর্পণ করা জায়েয নয়, যে লোক তার যোগ্য নয়। বরং প্রতিটি পদের জন্য নিজের ক্ষমতা ও সাধ্যানুযায়ী যোগ্য ব্যক্তির অনুসন্ধান করা কর্তব্য। যোগ্যতা ও পরিপূর্ণ শর্ত মোতাবেক কোনো লোক না পাওয়া না গেলে উপস্থিত লোকদের মধ্যে যোগ্যতা ও আমানতদারি তথা সততার দিক দিয়ে যে সবচেয়ে অগ্রবর্তী হবে, তাকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। [তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন, পৃষ্ঠা : ২৫৮-২৫৯]

আবু যার (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাকে কোনো পদে নিয়োগ করবেন না? আবু যার (রা.) বলেন, (আমার কথার জবাবে) তিনি আমার কাঁধের উপর স্বহস্তে আঘাত করে বললেন, হে আবু যার! তুমি হচ্ছে দুর্বল প্রকৃতির লোক। এটা হচ্ছে একটা আমানত। কিয়ামতের দিন এটা (পদাধিকারীর জন্য) অপমান ও অনুতাপের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু যে ব্যক্তি এই পদের হক যথাযথ ভাবে আদায় করবে এবং দায়িত্ব ও

কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করবে তার কথা স্বতন্ত্র। [সহীহ মুসলিম, ইস. সে. হা: ৪৫৭১]

তাই ইসলামী জামাআতের কোনো নেতা-কর্মী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য লালায়িত নয়। তবে কোনো দায়িত্ব কারো উপর অর্পিত হলে, সে আমানতদারিতার সাথে তা পালন করে। কিন্তু কেউ কোনো পদ বা দায়িত্ব চেয়ে নিতে পারবে না। যদি কেউ কোনো পদের দাবিদার হয় তাকে তা দেয়া হয় না। এ সম্পর্কে হাদীসে এসেছে,

আবু মূসা আশআরী (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি ও আমার চাচাত ভাই নবী (সা.) এর নিকট গেলাম। তাদের একজন বলল, হে আল্লাহর রাসূল! মহামহিম আল্লাহ আপনাকে যে রাজত্ব দান করেছেন তাতে আমাকে কোনো একটি কাজে নিয়োগ করুন। অপর লোকটিও অনুরূপ আরজি পেশ করল। জবাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, আল্লাহর শপথ! আমরা এ কাজের দায়িত্বে এমন কাউকে নিয়োগ করি না, যে তা চায়। আর এমন কাউকেও নিয়োগ করি না, যে তা পাবার লালসা করে। [সহীহ বুখারী, ই.ফা.বা হাদীস: ৬৬৬৪; সহীহ মুসলিম, ইস. সে. হাদীস: ৪৫৬৯]

কারণ যারা ক্ষমতার লোভ করে তারা ক্ষমতায় বসলে জনগণের স্বার্থ রক্ষার চেয়ে নিজের স্বার্থ রক্ষায় সচেতন থাকার সম্ভাবনা বেশি। তবে যদি এ রকম মনে করে যে, এ বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা বেশি, তাহলে দায়িত্বশীলকে পরামর্শ দিয়ে তার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে পারে। দায়িত্বশীল প্রয়োজন বোধ করলে তার পরামর্শ গ্রহণ করতে পারে অথবা তাকেই ঐ দায়িত্ব অর্পণ করতে পারে। আমাকে অমুক বিষয়ের দায়িত্বশীল করা হোক এ জাতীয় দাবি মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়।

অনৈসলামী জামাআতের ক্ষেত্রে দেখা যায়, কর্মীদের মাঝে কে কেমন অর্থ-সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী তার উপর নির্ভর করে সে কোন্ পর্যায়ের নেতৃত্ব বা দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে। এ সংগঠনে শেগি, গোত্র, বর্ণ, পেশা বা প্রভাব-প্রতিপত্তির দ্বারা

উঁচু-নীচ মূল্যায়ন করা হয়। অনেক যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিও স্থানীয় পর্যায়ে ছোটখাট দায়িত্ব ছাড়া কখনো বড় কোনো দায়িত্ব প্রাপ্ত হয় না। তারা যত যোগ্যতাই অর্জন করুক না কেন তা বিবেচনা করা হয় না। স্বজনপ্রীতি, স্বার্থপরতার ফলে অযোগ্য-অকর্মণ্য লোকেরাই বিভিন্নস্তরে নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হয়।

আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী (সা.) এক মজলিসে লোকদের সাথে কথা বলছিলেন। এমন সময় এক বেদুইন এসে বলল, কিয়ামত কখন হবে? রাসূল (সা.) বিরতি না দিয়ে কথা বলে চললেন। উপস্থিত লোকদের কেউ কেউ বলতে লাগলো, লোকটির কথা তিনি শুনছেন কিন্তু অপছন্দ করেছেন। কেউ বলল, তার কথা তিনি আদৌ শুনেননি। অবশেষে কথা বলা শেষ করে তিনি বললেন, কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্নকারী লোকটি কোথায়? সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.) এই যে আমি। তিনি বললেন, যখন আমানত ধ্বংস হয়ে যাবে তখন কিয়ামতের জন্য অপেক্ষা করো। প্রশ্নকারী বলল, আমানত নষ্ট করার অর্থ কি? তিনি বললেন, যখন অনুপযুক্ত লোককে সরকারি কাজের দায়িত্ব দেয়া হবে তখন কিয়ামতের অপেক্ষা করো। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬০৫২]

রাসূল (সা.) ইরশাদ করেছেন, যাকে সাধারণ মুসলমানদের কোন দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, তারপর যদি কাউকে তার যোগ্যতা যাচাই ছাড়াই একান্ত বন্ধুত্ব কিংবা সম্পর্কের কারণে কোনো পদে নিয়োগ প্রদান করে তবে তার উপর আল্লাহর লানত। না তার ফরয (ইবাদাত) কবুল হবে, না নফল। এমনকি সে জাহান্নামে প্রবিষ্ট হবে। [তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন, পৃষ্ঠা : ২৫৯]

কিন্তু অনৈসলামী জামাআতে নেতৃত্বের ক্রমধারা রাজতন্ত্রের মতো বংশানুক্রমে চলতে থাকে। তাই সাধারণ কর্মীরা নেতৃত্বের উচ্চাসনে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়। বিশেষ বিশেষ কিছু দিবস বা অনুষ্ঠান ছাড়া সাধারণ কর্মী-সমর্থকরা থাকে সর্বদা উপেক্ষিত। নেতা ও কর্মীদের

মাঝে অদৃশ্য দেয়াল দ্বারা পার্থক্য সৃষ্টি করা হয়। ফলে নেতৃত্বস্থানীয়রা সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করলেও কর্মী-সমর্থকরা থাকে বঞ্চিত। তাই নেতা-কর্মীরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য থাকে লালায়িত। তারা কোনো পদ চেয়েই ক্ষান্ত হয় না; বরং তা পাওয়ার জন্য অন্যের উপর যুলুম-নির্যাতন, হত্যা সহ সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সম্ভাবনাময় কোনো কর্মী নেতৃত্বের দাবিদার হয়ে উঠতে পারে এ আশংকায় নিজ কর্মীকে নির্মমভাবে হত্যা করতেও কুণ্ঠিত হয় না। আবার কোনো নেতার কারণে কোনো কর্মী বা অন্য কেউ কাক্ষিত পদে আসীন হতে ব্যর্থ হলে চোরাগুপ্তা হামলার মাধ্যমে নেতাকেই হত্যা করে ফেলে। এভাবে হত্যা পাল্টা হত্যা কখনো কখনো ভয়াবহরূপ ধারণ করে। যে সকল কর্মীরা কখনো কোনো ক্ষমতা বা পদ পাবে না এটা বুঝতে পারে তারা নেতাদের আশির্বাদপুষ্ট হয়ে টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, ছিনতাই, খুন, ধর্ষণ, অন্যের জায়গা-জমি দখলসহ বিভিন্ন অন্যায়-অপকর্মে লিপ্ত হয়। এদের যুলুম-নির্যাতনে সাধারণ জনগণ থেকে শুরু করে দলীয় নেতা-কর্মীরাও অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। কিন্তু কেউ কোনো প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করতে পারে না। নেতা-নেত্রীরা প্রতিবাদ করে না এজন্য যে, এসব কর্মীরাই তাদের ক্ষমতার খুঁটিকে মজবুত করে ধরে রেখেছে। আর সাধারণ মানুষ নিজেদের জান-মালের ক্ষয়-ক্ষতির কথা ভেবে নীরবে সব সয়ে যাচ্ছে। রাষ্ট্রীয় প্রশাসনযন্ত্রও এদের কাছে বিকল। এদের শত অপরাধকেও তারা মার্জনার চোখে দেখতে বাধ্য। কারণ যদি এদের ছাড় না দেয় তাহলে তাদের দুর্নীতি, ঘুষ, অবৈধ উপার্জন সব বন্ধ হয়ে যাবে। যে অল্প সংখ্যক সং লোক রয়েছে নিরুপায় হয়ে তারা চোখ বুজে সব সহ্য করছে। এসব অনৈসলামী সংগঠনগুলো মানবসেবার গাল ভরা বুলি আওড়িয়ে অবলীলাক্রমে তাদেরকেই শোষণ করে যাচ্ছে।

চলবে ইনশা আল্লাহ

আমরা ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার কথা বলি, এই ব্যাপারে তাওয়াক্কুলের কথা বলি, আল্লাহর সাহায্যের কথা বলি কিন্তু ফারযিয়াত পালনের ক্ষেত্রে মাক্কি জীবনের দোহাই কিম্বা শারীয়াতে স্থান নেই এমন সব পূর্বশর্ত জুড়ে দেই। দাওয়াহর ক্ষতি হয়ে যাবে (!), কুফফার রাগ করবে, আমাদের মুসলিমদের ব্যাপারে খারাপ ধারণা করবে এজন্য আল্লাহর রাসূল (সা.) এর অবমাননার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করি।

তাওয়াক্কুল করার অর্থ কী?

আসিফ আদনান



শাদ্দিকভাবে তাওয়াক্কুলের রাফ অনুবাদ হলো— আল্লাহর উপর ভরসা করা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাওয়াক্কুল করার অর্থের ব্যাপকতা ঠিক এই অনুবাদে ধরা যাচ্ছে বলে মনে হয় না। থিওরিটিক্যালি তাওয়াক্কুল করা সম্পর্কে জানা, বোঝা কিম্বা কথা বলা আর বাস্তবে এটাকে কাজে পরিণত করার মধ্যে তফাৎ শত সহস্র কোটি যোজনের। আমরা এমন এক সময়ে বসবাস করছি, যখন ইসলাম মেনে চলেন বা মেনে চলার চেষ্টা করেন এমন মানুষও জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, ভিন্ন ভিন্ন অ্যাসপেক্টে তাওয়াক্কুল করার সাহস পান না।

ব্যাংকের চাকরিটা ছেড়ে দিলে কী হবে! ব্যাংক লোনটা না নিলে ব্যবসার এক্সপ্যানশান কী করে হবে?

অথবা কোনো রকম ব্যাংক না থাকলে কেউ ব্যবসা করতে পারবে না (!), তাই রিবা আর রিবার ধূলোকে একটু “ইসলামাইজ” করা যাক— এরকম চিন্তা করে আমরা অনেকে “রিবা” ছেড়ে আসতে পারি না।

আমরা মুখে তাওয়াক্কুলের কথা বললেও সম্পূর্ণভাবে শারীয়াহ মেনে

চলতে গেলে কত শত সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে, সমাজের কত তির্যক বাক্যবাণ আর ভ্রুকুটি সহ্য করতে হবে, সমবয়সীদের তুলনায় কত ব্যাকডেটেড, অবসোলিট, আনকালচার্ড, আনসফিসটিকেটেড (!) হয়ে পড়ব সেই আতংকে ভুগতে থাকি।

আমরা ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার কথা বলি, এই ব্যাপারে তাওয়াক্কুলের কথা বলি, আল্লাহর সাহায্যের কথা বলি কিন্তু ফারযিয়াত পালনের ক্ষেত্রে মাক্কি জীবনের দোহাই কিম্বা শারীয়াতে স্থান নেই এমন সব পূর্বশর্ত জুড়ে দেই। দাওয়াহর ক্ষতি হয়ে যাবে (!), কুফফার রাগ করবে, আমাদের মুসলিমদের ব্যাপারে খারাপ ধারণা করবে এজন্য আল্লাহর রাসূল (সা.) এর অবমাননার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করি। আমরা শুধু এমনটা করেই ক্ষান্ত হই না, সাথে সাথে আমাদের এহেন কর্মের পক্ষে যুক্তি তৈরি করে ফেলি। নেসেসিটির কথা বলি। অনেক ক্ষেত্রে তাওয়াক্কুল করা আর ভ্রষ্ট সুফীদের নিষ্ক্রিয়তাকে এক করে ফেলি। অনেক ক্ষেত্রে তাওয়াক্কুল করাকে আকারে

আমাদের যুগে
তাওয়াঙ্কুলের এরকম
উদাহরণ বিরল।
দুনিয়াকে উপেক্ষা করে
একমাত্র আল্লাহ আয্যা
ওয়া জাল্ল এর উপর
ভরসা করতে পারেন
এবং এর উপর দৃঢ়
থাকতে পারেন এমন
বান্দা খুঁজে পাওয়া
অত্যন্ত কঠিন। কঠিন,
কিন্তু অসম্ভব না।
আমাদের মধ্যে শতকরা
৯৯ জন খুব
প্রাগম্যাটিক, প্রাস্টিকাল
হয়ে গেলেও এখনও
উম্মাতে মুহাম্মাদির মধ্যে
এরকম কিছু মানুষ খুঁজে
পাওয়া যায় যারা অন্য
ধাতুতে গড়া। যারা
পারেন সমগ্র দুনিয়া,
সমগ্র বাস্তবতা, সমগ্র
র্যাশেন্যালিটি উপেক্ষা
করে তাওয়াঙ্কুল করতে।
এরকম এক বান্দার গল্প
দিয়ে শেষ করছি।
মুসলিমদের প্রচণ্ড
দুরবস্থা চলছে। সম্ভবত
ইতিহাসে এর চাইতে
অন্ধকার কোনো সময়
উম্মাহকে অতিক্রম
করতে হয়নি। কাফিররা
শারীয়াহর শাসন উচ্ছেদ
করেছে। এজেন্ট
শাসকগোষ্ঠীর মাধ্যমে
মুসলিম ভূখণ্ডগুলোর
উপর কাফিররা তাদের
নিয়ন্ত্রণ পাকাপোক্ত করে
নিয়েছে। এমনকি পবিত্র
ভূমি বাইতুল মাকদিসও
তাদের দখলে চলে
গেছে।

ইঙ্গিতে অবুঝ, বিবেচনাহীন, নির্বোধের
আচরণ বলি।

তাই ‘তাওয়াঙ্কুল করার প্রকৃত অর্থ কী’
এটা আমাদের থিওরি দিয়ে বোঝানো
খুব কঠিন। এজন্য প্র্যাকটিক্যাল
উদাহরণ দিই। উদাহরণটা দিচ্ছি এমন
সব মানুষদের জীবন থেকে যাদের
চাইতে ভালভাবে আর কোন প্রজন্ম
ইসলাম বোঝেনি, পালন করেনি,
আঁকড়েও ধরেনি।

মুসলিমরা মাত্র মিসর জয় করেছে।
মিসরের অধিবাসীরা কুফর ও শিরক
ছেড়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে। কিবতি
(Copt) ক্যালেন্ডার অনুযায়ী তখন
বু’না নামক মাস চলছে। মুসলিম
বাহিনীর প্রধান আমর ইবনুল আস
(রা.) বিজয়ীর বেশে মিসরে প্রবেশ
করেছেন। এমন সময় মিসরের
লোকজন তাঁর কাছে এসে বলল,
“হে আমাদের আমীর! আমাদের
নীলনদের একটি প্রথা আছে, যা পালন
না করলে তা প্রবাহিত হয় না। এ
মাসের বারো তারিখ শেষ হলে আমরা
একটি কুমারী মেয়েকে তার
পিতা-মাতার সম্মতিক্রমে সর্বোত্তম
পোশাক ও অলঙ্কারাদি পরিয়ে নীলনদে
ফেলে দেই।”

সচেতন পাঠকমাত্রই জানার কথা মিসর
নীলনদের প্রবাহের ওপর কতটা
নির্ভরশীল। ঐতিহাসিকভাবে মিসর
অনাবৃষ্টির জায়গা। আর এখানকার
মাটি বালুময়, যা ফসল উৎপাদনের
জন্য উপযোগী নয়। নীলনদ হয়ে যে
পানি ও পলি মাটি আসে তা থেকেই
মিসরবাসীর প্রয়োজনীয় ফসলাদি
উৎপন্ন হয়।

তাই মিসরবাসীর এই প্রথা কোনো
উৎসব বা কালচারাল ব্যাপার ছিল না।
বরং এটা ছিল তাদের জীবন ও
জীবিকার প্রশ্নের সাথে জড়িত। আমর
ইবনুল আস (রা.) মিসরবাসীর কথা
শোনার পর বললেন,
“ইসলামে এটা চলবে না। পূর্বের সব
কুসংস্কারকে ইসলাম নির্মূল করে
দেয়।”

মিসরবাসী আমর ইবনুল আস (রা.)
কথা শুনে ফিরে গেল। বু’না মাস কেটে

গেল। পানির দেখা নেই। বু’নার পর
আবীব মাস চলে গেল। নীলনদে কোন
পানি আসলো না। তারপর মাসরা
মাসও কেটে গেল। নীলনদ প্রবাহিত
হচ্ছে না। তিন মাস অপেক্ষার পর
লোকজন মিসর ছেড়ে অন্য কোন
জায়গায় চলে যাবার প্রস্তুতি নেয়া শুরু
করল। কুমারী বলি দেয়া হয়নি।
নীলনদ প্রবাহিত হবে না। পানিও
পাওয়া যাবে না, তাই এখানে বসবাসও
আর করা সম্ভব না।

নিরুপায় হয়ে আমর ইবনুল আস (রা.)
চিঠি লিখলেন খলীফার কাছে। উম্মাহর
দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, আমীরুল মুমিনীন,
আল-ফারুক, উমর ইবনুল খাত্তাব
(রা.) এর কাছে। উমর (রা.) জবাব
দিলেন—

“(আমর) তুমি যা করেছ ঠিকই করেছ,
আমি তোমার কাছে একটি চিরকুট
পাঠাচ্ছি। এই চিরকুটটি তুমি নীলনদে
ফেলে দিও।”

কী ছিল চিরকুটে?

কেন আমীরুল মুমিনীন নীলনদে একে
ছুঁড়ে ফেলতে বলেছিলেন?

আমর ইবনুল আস (রা.) খলীফার চিঠি
ও নির্দেশ পাবার পর চিরকুটটি খুলে
দেখেছিলেন। সেখানে লেখা ছিল—
“আল্লাহর বান্দা আমীরুল মুমিনীন
উমরের পক্ষ থেকে মিসরের নীলনদের
প্রতি। হামদ ও সালাতের পর :
(হে নীলনদ!) তুমি যদি নিজ ক্ষমতায়
প্রবাহিত হয়ে থাকো, তাহলে প্রবাহিত
হয়ো না। আর যদি মহাপরাক্রমশালী
এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ তোমাকে
প্রবাহিত করে থাকেন, তাহলে তাঁরই
কাছে আমরা প্রার্থনা করছি যেন তিনি
তোমাকে প্রবাহিত করেন।”

আমর ইবনুল আস (রা.) আমীরুল
মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) এর
পাঠানো সেই চিরকুটটি নীলনদে
নিষ্ক্ষেপ করলেন। পরদিন দেখা গেল
আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্ল নীলনদকে
এমনভাবে প্রবাহিত করে দিয়েছেন যে,
এক রাতে ষোল হাত পানি বৃদ্ধি
পেয়েছে। [সূত্র : ইবনু কাসীর, আল
বিদায়া ওয়ান নিহায়া, প্রথম খণ্ড]

আমাদের যুগে কেউ যদি এরকম কিছু করেন বা নিছক প্রস্তাবও করেন তাহলে একশ'তে নিরানব্বই জন হয়ত তাকে নিয়ে হাসাহাসি করব। আমরা মুসলিমরাই করব। কিন্তু এটাই কি প্রকৃত তাওয়াক্কুল না? আমাদের খুব ভাল মতো, সময় নিয়ে, ভেবে দেখা উচিত— কেন এরকম ভাবে তাওয়াক্কুল করা তো দূরে থাক এরকম করার চিন্তাই আমাদের জন্য দুঃসাধ্য।

যে আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্ল নীলনদকে সেদিন প্রবাহিত করেছেন, তিনিই আজো নীলনদকে প্রবাহিত করেন। তিনি চিরন্তন, তিনি হাইয়ুল কাইয়ুম। যেই ইসলামের ছায়াতলে এসে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) এই চিরকুট লেখার মতো ইয়াকীন অর্জন করেছিলেন, সেই ইসলামও অপরিবর্তিত। তাহলে কোন্ জায়গায় সমস্যা? আমাদের খুব, খুব গুরুত্বের সাথে এই ব্যাপারটা ভেবে দেখা উচিত।

আমাদের যুগে তাওয়াক্কুলের এরকম উদাহরণ বিরল। দুনিয়াকে উপেক্ষা করে একমাত্র আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্ল এর উপর ভরসা করতে পারেন এবং এর উপর দৃঢ় থাকতে পারেন এমন বান্দা খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। কঠিন, কিন্তু অসম্ভব না। আমাদের মধ্যে শতকরা ৯৯ জন খুব প্র্যাগম্যাটিক, প্র্যাগ্টিকাল হয়ে গেলেও এখনও উম্মাতে মুহাম্মাদির মধ্যে এরকম কিছু মানুষ খুঁজে পাওয়া যায় যারা অন্য ধাতুতে গড়া। যারা পারেন সমগ্র দুনিয়া, সমগ্র বাস্তবতা, সমগ্র র‍্যাশেন্যালিটি উপেক্ষা করে তাওয়াক্কুল করতে। এরকম এক বান্দার গল্প দিয়ে শেষ করছি।

মুসলিমদের প্রচন্ড দুরবস্থা চলছে। সম্ভবত ইতিহাসে এর চাইতে অন্ধকার কোনো সময় উম্মাহকে অতিক্রম করতে হয়নি। কাফিররা শারীয়াহর শাসন উচ্ছেদ করেছে। এজেন্ট শাসকগোষ্ঠীর মাধ্যমে মুসলিম ভূখন্ডগুলোর উপর কাফিররা তাদের নিয়ন্ত্রণ পাকাপোক্ত করে নিয়েছে। এমনকি পবিত্র ভূমি বাইতুল মাকদিসও

তাদের দখলে চলে গেছে।

উম্মাহ সবদিক দিয়ে হতোদ্যম হয়ে পড়েছে। বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে কাফিরদের গোলামিকেই নিজেদের অদৃষ্ট হিসেবে মেনে নিয়েছে। “কোনভাবেই কাফিরদের বিপুল অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তির মুকাবিলা করা সম্ভব না” -এই ধারণা তাদের মনে জেকে বসেছে। ইসলামের বদলে অন্য আদর্শ ও জীবনব্যবস্থার মধ্যে মুসলিমরা সাফল্য খুঁজছে।

এমন অবস্থায় হঠাৎ কিছু আশ্চর্য ঘটনা ঘটা শুরু করল। একজন মুসলিম যোদ্ধা কাফিরদের সব চাইতে শক্তিশালী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে সারা পৃথিবীতে হাইচই ফেলে দিলেন। তিনি এটুকুতেই থেমে থাকলেন না। অকল্পনীয়কে সম্ভব করলেন। সমগ্র পৃথিবীর চোখের সামনে তিনি কাফিরদের এই রাষ্ট্রকে আক্রমণ করে রক্তাক্ত ও অপমানিত করলেন। কাফিররা তাকে হত্যা বা বন্দী করার জন্য উন্মাদ হয়ে গেল।

এই বীর যোদ্ধা আশ্রয় নিলেন এক দরিদ্র, রুক্ষ, পশ্চাৎপদ, পার্বত্য অঞ্চলে যেখানে এমন একজন শাসক ছিলেন যিনি হকের উপর দৃঢ় ছিলেন, নিজের সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে শারীয়াহ আঁকড়ে ধরে ছিলেন। সমগ্র বিশ্বের মধ্যে একমাত্র এই একটি জায়গা ছিল যেখানে শারীয়াহ প্রতিষ্ঠিত ছিল। পঞ্চাশেরও বেশি কাফির রাষ্ট্র জোট বেধে তাদের বিপুল সামরিক এবং অর্থনৈতিক শক্তি নিয়ে এই ভূখন্ডের শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলো। তারা এই ভূখন্ডের শাসক কাছে একটা মেসেজ পাঠাল—

“হয় তুমি এই যোদ্ধাকে আমাদের হাতে তুলে দেবে, অথবা আমরা তোমার এই দেশকে গুড়িয়ে দেবো। আমাদের ক্রোধ থেকে তুমি এবং তোমার জাতি রেহাই পাবে না।”

মুসলিম শাসক জবাব দিলেন -

“আমি দুটো প্রতিশ্রুতি বিবেচনা করছি। একটি হলো কাফিরদের প্রতিশ্রুতি, আরেকটি হলো আল্লাহ

তাআলার প্রতিশ্রুতি। আল্লাহ আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তাঁর এই যমিন বিস্তৃত। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তাঁর পথে চলবে, সে পৃথিবীর যেখানেই থাকুক, আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করবেন। কাফিররা আমাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, আমি পৃথিবীর যেখানেই থাকি না কেন তাদের হাত থেকে আমি রেহাই পাবো না। আমি দেখতে চাই, কার প্রতিশ্রুতি সত্য!”

এই জবাবের পর তিনিও তাঁর বাহিনী নিয়ে কাফিরদের জোটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। এক অসম যুদ্ধ। একদিকে সব চাইতে শক্তিশালী অর্থনীতি, সব চাইতে আধুনিক সামরিক বাহিনী, সর্বোত্তম টেকনোলজি আর কাটিং এজ সমরাস্ত্র। অন্যদিকে কিছু গরিব যোদ্ধা, যাদের সম্বল হলো সেকেলে কিছু অস্ত্র আর তাওয়াক্কুল আলাল্লাহ।

ফলাফল?

এই র‍্যাশনালিস্ট, প্র্যাগম্যাটিক আমাদের কাছে যা অকল্পনীয় তাই ঘটে গেল। পঞ্চাশের বেশি কাফির রাষ্ট্রের জোট পরাজিত হলো। কাফিররা আবারো অপমানিত হলো। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য প্রমাণিত হলো। আল্লাহ তাআলা তাঁর উপর ভরাসাকারীকে সম্মানিত করলেন। তাঁকে হিফাযত করলেন কাফিরদের কাছ থেকে এবং তাঁকে ও তাঁর বাহিনীকে বিজয়ী করলেন।

মজার ব্যাপারটা হচ্ছে, আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) এর পথ অনুসরণের মাধ্যমে উম্মাহর সামনে তাওয়াক্কুলের অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করা এই মানুষটার নামও ছিল উমর! আল্লাহ তাআলা তাঁকে যেন রহমতের চাঁদর দিয়ে ঢেকে রাখেন তাঁকে জান্নাতে সুউচ্চ মাকাম দান করেন, তাঁর মতো সন্তান মুসলিম মায়েদের গর্ভে দান করেন এবং সমগ্র পৃথিবীতে তাঁর বাহিনীকে বিজয় দান করেন। আমীন।

নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করবে আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট।

পেপসি : কী খাচ্ছেন একটু ভেবে দেখবেন কি?

শেখ সাফওয়ানা জেরিন



নামের মাঝেই লুকিয়ে আছে যার সৃষ্টিরহস্য
যদিও পেপসির জন্ম ১৮৯৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রে বলে
অনেকেই এটাকে ইহুদিদের পণ্য বলতে দ্বিধাবিহীন হন।
কিন্তু একটা জিনিস আমরা ভুলেই যাই যে, এই
ইস্রাইলের জন্ম ফিলিস্তিনে হওয়ার অনেক আগেই
আমেরিকায় একটা মিনি ইস্রাইলের জন্ম হয়েছিল, যার
জনগণেরাই আমেরিকার অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করতো।
সুতরাং আমেরিকায় জন্ম হওয়া কোনো কোম্পানি
ইস্রাইলের স্বার্থ রক্ষায় কাজ করলে তাতে এতো অবাক
হওয়ার কিছু নেই। বরং এটাই স্বাভাবিক।
যা বলছিলাম, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানের ইসলামিক
স্কলার থেকে শুরু করে বিভিন্ন মুসলিম দেশের

গণমাধ্যমগুলোতে পেপসির পূর্ণরূপ
নির্নে অনেক আলোচনা হয়েছে।
PEPSI= Pay Every Penny
Save Israil
Penny (পেনি) মানে ডলারের
ক্ষুদ্রতম একক। আমাদের দেশে যেমন
একটাকার কোনো মূল্য নেই, অথচ
একটাকা দিয়েই সমস্ত অর্থনৈতিক
কাজের সূচনা ঠিক তেমনি ইস্রাইল এই
গুরুত্বপূর্ণ এক পেনি, অর্থাৎ অর্থনৈতিক
যেকোন কাজের সূচনায় ব্যবহৃত এই
ভাংতি এক টাকা প্রদান করতে বলছে।
বাংলাদেশে এই একটাকা এখন একটি
চকলেট সমমূল্য দাম। অনেক ক্ষেত্রেই
একটাকা আমরা দোকানদার বা
রিকশাওয়ালা না দিতে পারলে দাবি
ছেড়ে দেই। অর্থাৎ এই একটাকার
ইউজ ভ্যালু অনেক কম, কিন্তু এই যে
এই একটা টাকা আমাদের প্রয়োজন
হচ্ছে না, এটাও ইহুদিরা চায় ওদের
রক্ষায় ব্যবহার হোক। আর বাদবাকি
আপনার আমার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের
উপর তাদের কী পরিমাণ আধিপত্য
থাকতে পারে সেটা আল্লাহই জানেন।
আপনি এক পয়সা দিয়ে হলেও
ইস্রাইলকে রক্ষা করার কাজে জড়িত
নেই তো?

পেপসি একটি নামকরা কোমল পানীয়
কোম্পানি, যার বিস্তৃতি পৃথিবীর ২০০
দেশে। যা ২২ ধরনের পণ্য উৎপন্ন
করে। যার বার্ষিক আয় ৬৫ বিলিয়ন
ডলার।

এর অন্যতম পণ্যগুলো হলো- frito
lay, Tropicana, quaker
ইত্যাদি।

বাংলাদেশে পেপসির নতুন পণ্য
মিনারেল ওয়াটার আকুয়াফিনাই নতুন
যাত্রা করেছে, যা এখন দোকানে
দোকানে মামের বদলে পাওয়া যাচ্ছে।

আপনি কি জানেন পেপসির লোগোর
মানে?

পেপসির লোগোতে B P S I মানে
ইহুদিদের আনন্দমাখা বিজয়, আর লাল
বৃত্ত মানে মুসলিমদের রক্ত। নীল
সাগরে মুসলিমের রক্ত দিয়ে সূর্যোদয়ের
দৃশ্য। ২০০৬ সালের অক্টোবর মাসে
নেদারল্যান্ডের লেখক Mr.

Bendada তার একটি গবেষণামূলক প্রতিবেদনে পেপসির লোগোর এই ব্যাখ্যা দেন। এছাড়াও তিনি বলেন-
“যদি তুমি Pepsi-কে উল্টো করো (isdod এভাবে) এবং এর মাঝে একটি 'A' বসাতো (isdoad) যার অর্থ হিব্রু ভাষায় দাঁড়ায়- ইস্রাইল।”

শুকরের চর্বি মিশ্রিত পেপসি

১৯৮৭ সালে একটি বিখ্যাত বই প্রকাশিত হয় যার নাম- Picture is not shown বইটিতে দেখানো হয়, কীভাবে শুকরের অতিরিক্ত চর্বি প্রক্রিয়াজাত করে পেপসিতে মিশানো হয়। এরপর অবশ্য দেশে দেশে মুসলিমরা পেপসি বর্জনের ডাক দেয়। ২০০৬ সালে আর-রিয়াদ পত্রিকায়ও পেপসিতে শুকরের চর্বি মিশ্রিত করার ব্যাপারে গবেষণাধর্মী প্রতিবেদন প্রকাশ হয়।

শুকরই একমাত্র প্রাণী যা ময়লা-আবর্জনা, গোবর, মল-মূত্র খায়- যা এর শরীরে তৈরি করে প্রাণঘাতী জীবাণু ও অণুজীব। তাই শুকর খাওয়া সম্পূর্ণ হারাম। পেপসি শুধু ফিলিস্তিনে গণহত্যার মদদদাতাই নয়, বরং পেপসির সাথে মুসলিমদের জন্য অত্যন্ত সেনসিটিভ ইস্যু হালাল হারামও যুক্ত।

গবেষণায় জানা গেছে- পেপসি বানানো হয় Pig sausage দিয়ে যা ক্যানসারের ঝুঁকি বহন করে।

আসক্তি তৈরিকারী পেপসি

সেদিন এক লোক বলছিল- পেপসিতে এমন কিছু একটা আছে, যা খেলে নেশার মতো লাগে, বা বারবার খেতে মন চায়। মানুষের অভ্যাসে পরিণত হয়। তিনি দিনে গড়ে ৪ লিটার পেপসি খান। যে পদার্থের কারণে তার এমন বারবার খেতে মনে চায় সে পদার্থটির নাম Aspartame. এটা এমন এক পদার্থ যা মানুষের মধ্যে নেশা তৈরি করে দেয় ঐ পণ্য বারবার খেতে। এমনকি গবেষকগণ প্রমাণ করেছেন, সামান্য পরিমাণ এলকোহলও মিশ্রিত করা হয় এসব পণ্যের সাথে।

বিশ্ব মুসলিম নেতাদের দৃষ্টিতে পেপসি ২০০৮ সালের ২৩ এপ্রিল হামাস

আপনি যখন পেপসির ইহুদি পণ্য হওয়ার ব্যাপারে গুগলে সার্চ দিবেন, আপনি তথ্য নিয়ে সন্দেহে পড়ে যাবেন। কারণ, পেপসি নিয়ে বিতর্ক সারা পৃথিবীতে। আর ইহুদি খ্রিস্টানদের দোসররা ‘পেপসি ইহুদি পণ্য নয়’ এই প্রচারণা চালাতে ব্যস্ত।

মূলত কোকাকোলার মুখোশ যখন মুসলিম দেশগুলোতে উন্মোচিত হয়ে যায়, তখন আরব দেশগুলোর কোমল পানীয়ের বাজারে রাজত্ব করতে আমেরিকান এই কোম্পানির আবির্ভাব হয়। যার মালিক একজন ইহুদি-
গুথ ভি লোফ!

কিন্তু ব্যবসার শুরুতেই পেপসি ইস্রাইলে ব্যবসা করতে অস্বীকার জানিয়েছিল, যা একধরনের অভিনয় ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কারণ পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে পেপসি ইস্রাইলে ব্যবসা শুরু করে এবং তাদের ইহুদিপ্রীতির নানা প্রমাণ দেয়।

সংসদ সদস্য সালামে সালামাহ আল-আকসা টিভিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন-

“There are companies established by the colonialists and occupiers - large companies with branches all over the world, like Pepsi, Pepsi Cola. This is a well-known company. Pepsi is an acronym. P-E-P-S-I - Pay Every Pence to Save Israel. Pay every pence - pence is one-hundredth of a dollar - to save Israel. Pay every pence to save Israel...”

এই তো কিছুদিন আগে ফেব্রুয়ারি মাসেও আন-নাস টিভিতে মিশরের

ধর্মীয় নেতা হাজেম আবু ইসমাইল পেপসি বর্জনের ডাক দিলেন। তিনি বলেন-

"Pepsi means- Donate the small change you don't need, but give it to the right cause. If you collect small change, you can buy this drink. They took the first letter of each word- "Pay Every Penny Saving Israel" and they formed the word "Pepsi."

১৮ জানুয়ারি ২০০৯ বিবিসি নিউজের বরাতে জানা যায়-

KFC, Pepsi, CocaCola, Starbucks et Macdonalds are donating their next 2 weeks of earned revenue to Israel.

পেপসিকে অ্যান্টি ইহুদি পণ্য প্রমাণের পশ্চিমা প্রচেষ্টা

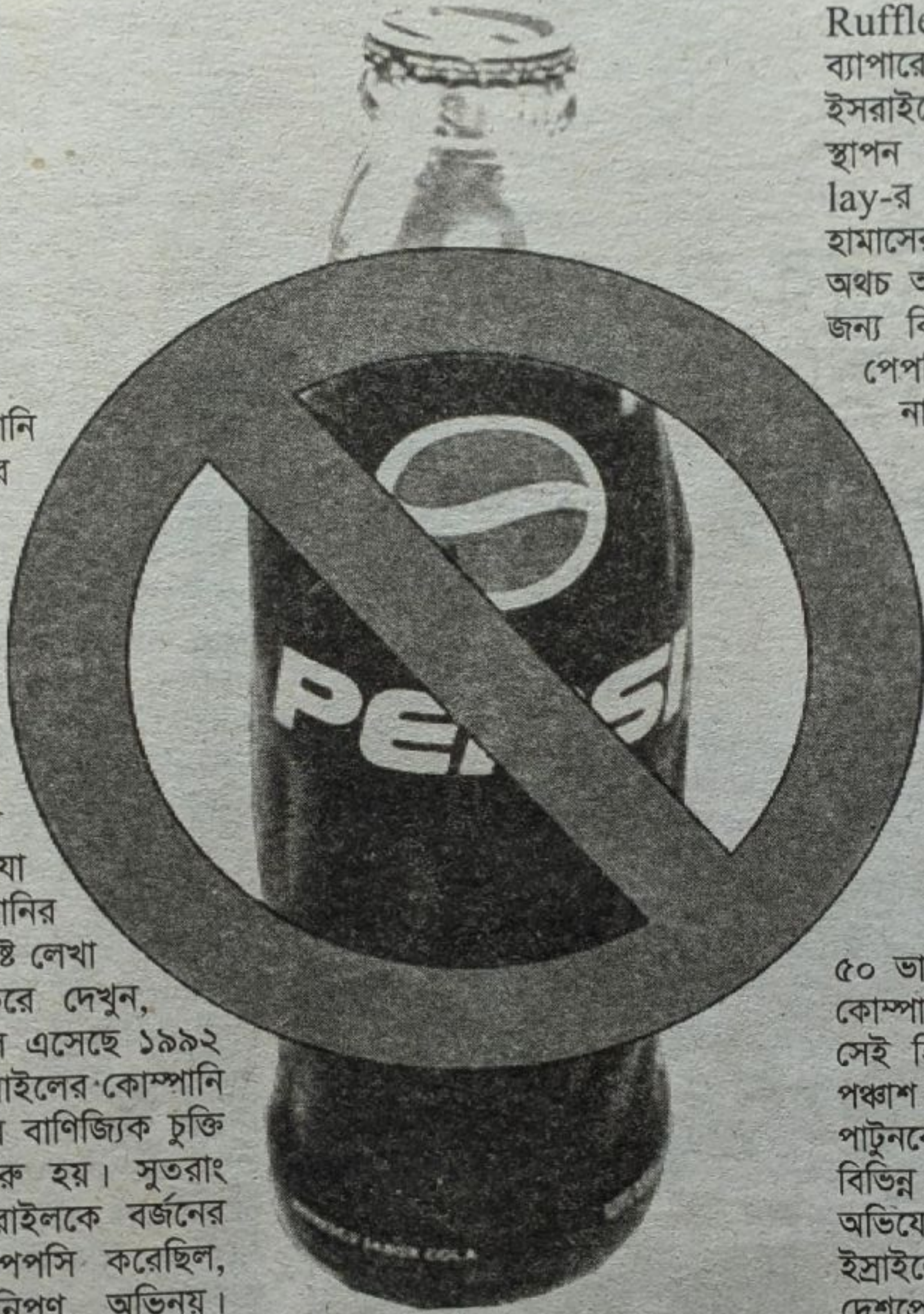
আপনি যখন পেপসির ইহুদি পণ্য হওয়ার ব্যাপারে গুগলে সার্চ দিবেন, আপনি তথ্য নিয়ে সন্দেহে পড়ে যাবেন। কারণ, পেপসি নিয়ে বিতর্ক সারা পৃথিবীতে। আর ইহুদি খ্রিস্টানদের দোসররা ‘পেপসি ইহুদি পণ্য নয়’ এই প্রচারণা চালাতে ব্যস্ত।

মূলত কোকাকোলার মুখোশ যখন মুসলিম দেশগুলোতে উন্মোচিত হয়ে যায়, তখন আরব দেশগুলোর কোমল পানীয়ের বাজারে রাজত্ব করতে আমেরিকান এই কোম্পানির আবির্ভাব হয়। যার মালিক একজন ইহুদি- গুথ ভি লোফ!

কিন্তু ব্যবসার শুরুতেই পেপসি ইস্রাইলে ব্যবসা করতে অস্বীকার জানিয়েছিল, যা একধরনের অভিনয় ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কারণ পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে পেপসি ইস্রাইলে ব্যবসা শুরু করে এবং তাদের ইহুদিপ্রীতির নানা প্রমাণ দেয়।

স্ট্রাস কোম্পানির সাথে পার্টনারশিপ পেপসিকোর ইস্রাইল প্রীতির সবচেয়ে বড় প্রমাণ ইস্রাইলের সবচেয়ে বড়

ফুড কোম্পানি
Strauss এর
সাথে
পার্টনারশিপ।
স্ট্রাস
কোম্পানির
সাথে বিগত
২০ বছর ধরে
পেপসির
পার্টনারশিপ
অত্যন্ত মজবুত। যা
ফ্রিস কোম্পানির
ওয়েব সাইটে স্পষ্ট লেখা
আছে। লক্ষ্য করে দেখুন,
পেপসি ইসরাইলে এসেছে ১৯৯২
সালে, অথচ ইসরাইলের কোম্পানি
ফ্রিসের সাথে এর বাণিজ্যিক চুক্তি
১৯৯০ সালে শুরু হয়। সুতরাং
বুঝাই যায় ইসরাইলকে বর্জনের
যেই অভিনয় পেপসি করেছিল,
সেটা এক সুনিপুণ অভিনয়।
American multinational
food and beverage
corporation এই ২ কোম্পানিকেই
সাবসিডি দিচ্ছে। পেপসি-ফ্রিস
ইসরাইলে নোনতা স্ন্যাক্স Frito lay
উৎপাদন করছে, এতে ২ কোম্পানিরই
শেয়ার আছে ৫০ ভাগ করে। শুধু তাই
নয়, ফ্রিস কোম্পানির সাথে ইসরাইলের
অন্যতম পণ্য Sabra hummus-ও
যুক্ত।
পেপসি আর ফ্রিস কোম্পানি
অনেকগুলো বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ। ফ্রিস
কোম্পানির অনেক পণ্য বিক্রিতে



পেপসিকে ঢালাও লাইসেন্স দেওয়া
আছে।
২০০৮ সালে আরেক ইসরাইলি ব্র্যান্ড
সাব্রা হামাস এর সাথে পেপসি ও ফ্রিস
৫০ ভাগ শেয়ারে রেফ্রিজারেট খাবারের
উন্নয়ন ও উৎপাদনে পার্টনার হয়।
ইসরাইলে এমন কোন শিশুও নেই যারা
ফ্রিস কোম্পানির দুগ্ধজাত পণ্য
Danone আর Yo Tvata-র নাম
জানে না। ফ্রিস কোম্পানি তাদের
ওয়েব সাইটে ইসরাইলের প্রতি তাদের

সামাজিক দায়িত্ব এবং সমর্থনের
ব্যাপারে প্রকাশ্য লিখে রেখেছে।
তারা অধিকৃত প্যালেস্টাইনের বিভিন্ন
অঞ্চলে স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ
সাহায্য দিয়ে থাকে। পেপসির সাথে
১৯৯২ সালে Chetoos and
Ruffles প্রক্রিয়াজাত করণের
ব্যাপারে তাদের চুক্তি। ১৯৯২ সালে
ইসরাইলের Sderot-এ কোম্পানি
স্থাপন করে। ১৯৯৮ সালে Frito
lay-র পার্টনার, ২০০৮ এ সাবরা
হামাসের সাথে পার্টনার হয় পেপসি।
অথচ আপনার আমার আই ওয়াশের
জন্য বিভিন্ন জায়গায় লেখা আছে-
পেপসি আমেরিকান পণ্য, ইসরাইলে
নাকি বিজনেসই করতে চায়নি!

যারা ইসরাইলে বিজনেসই
করতে চায়নি, তারা
ইসরাইলে ২য় বৃহত্তম খাদ্য
উৎপাদনকারী কোম্পানির
সাথে ৫০ ভাগ শেয়ারে কি
এমনি এমনি চুক্তিবদ্ধ হয়?
নাকি ইহুদিদের সাথে
'অতি পিরিতি' এর পিছনে
প্রভাবক হিসেবে কাজ করে?

পেপসি, ফ্রিস ও বর্বর গোলানি
পাটুন

৫০ ভাগ শেয়ারে থাকা পেপসি ফ্রিস
কোম্পানির সকল কাজের অংশীদার।
সেই হিসেবে ফ্রিস কোম্পানি বিগত
পঞ্চাশ বছর ধরে ইসরাইলের গোলানি
পাটুনকে লালন-পালন করছে, যারা
বিভিন্ন সময় ফিলিস্তিনে বর্বর হামলার
অভিযোগে অভিযুক্ত। গোলানি পাটুন
ইসরাইলের সবচেয়ে দুর্ধর্ষ, সবচেয়ে
দেশপ্রেমিক সৈনিক হিসেবে পরিচিত।
যারা ফিলিস্তিনে হওয়া ইসরাইলের
যেকোন অভিযানে হিংস্রতার পরিচয়
দিতে সবচেয়ে এগিয়ে আছে। সুতরাং
ইহুদি ও তাদের দোসরদের পণ্য বর্জন
করুন। বর্জন করুন পেপসি, যা দিয়ে
আপনার ভাইয়ের বুক রক্তাক্ত করার
জন্য বুলেট কেনা হয়।

বি: দ্র যে বার কোডের নাম্বার ৭২৯
দিয়ে শুরু সেটি ইসরাইলি পণ্য।

সরকারের সফলতা ও জনতার ভোগান্তি

এ. আই. পল্লব



আমাদের দেশে যে পরিমাণ কলামিস্ট রয়েছে সে পরিমাণ পাঠকও নেই। প্রতিটি বিষয়ের উপর এত পরিমাণ বই লেখা হয় যে, প্রতিটি বইয়ের জন্য একজন করে পাঠক খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর। আমার এ বক্তব্যকে নিছক পাগলের প্রলাপ ভাবতে পারেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটাই আমাদের সমাজের বাস্তব চিত্র। আমার এ বক্তব্যের কারণ হলো একজন কলামিস্ট এত কষ্ট করে সমাজের চিত্রগুলো তুলে ধরে সমস্যা সমাধানে সবাইকে সচেতন করার

প্রচেষ্টা চালায়, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা পড়ে-ই দেখে না। আর যে দু' একজনে পড়ে তারা সমস্যা সমাধানে তেমন কোন ভূমিকা রাখতে পারে না। কারণ সমাজ পরিবর্তনে যারা ভূমিকা রাখতে পারে তারা - আজ নিজ স্বার্থোদ্ধারেই ব্যস্ত। কারো নীতি কথা বা কাকুতি-মিনতি তাদের হৃদয় স্পর্শ করে না। এজন্যই কলামিস্টের কলাম আর লেখকের বইয়ের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেলেও সমাজ পরিবর্তনে আজও

নতুন কোন দিশস্ত উন্মোচিত হয়নি। তবে আর কিছু থাক বা না থাক এদেশের মানুষের মাঝে একটি বিষয় ঠিকই লক্ষ্য করা যায় তাহলো কোনো একটি ইস্যু পেলে তা নিয়ে দিনের পর দিন চা স্টলে আলোচনা-সমালোচনার মেতে থাকা। সম্প্রতি সময়ে হাইওয়ে রোডে সি.এন.জি, অটো রিক্সা চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করার পর পক্ষে-বিপক্ষে বিভিন্ন জনে বিভিন্ন মন্তব্য করে অলস সময় পার করলেও আসলে এটা কতটুকু যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত হয়েছে তা যারা রাস্তা-ঘাটে চলাচল করে তারাই ভাল বলতে পারবে। একটি সমস্যা সমাধান করার ফলে যদি একাধিক সমস্যার সূত্রপাত ঘটে তবে তা সমাধান করার চেয়ে না করাই ভাল। সড়ক দুর্ঘটনা ও যানজট রোধ করলে সরকারের এ সিদ্ধান্তের ফলে এমনটাই ঘটেছে।

রাস্তা-ঘাটে সি.এন.জি/অটো রিক্সা চলাচলে বাঁধা দেয়ার ক্ষেত্রে পুলিশের ভূমিকা দেখে হতবাক হয়ে যাই; যে পুলিশ একজন সন্ত্রাসী বা চোর-ডাকাত ধরার ক্ষেত্রে হুবির, তারাই কত স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এ দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। এর পেছনে অবশ্য একটা কারণ আছে। আর তা হলো, হাইওয়ে রোডে কোথাও সি.এন.জি বা অটো রিক্সা দেখলে তা আটকিয়ে কিছু অর্থ হাতিয়ে নেয়া। এমনতেই আমাদের দেশের পুলিশের একটু বদনাম আছে। এবার সে বদনামটা আরেকটু ঝালাই করে নেয়ার সুযোগ এসেছে। কিছুদিন পূর্বে এক বাস স্ট্যান্ড থেকে একজন ভ্যান চালককে আটকিয়ে তার কাছ থেকে উদ্ধকোচ গ্রহণ করে ছেড়ে দিয়েছে জনগণের সেবায় নিয়োজিত এক পুলিশ সদস্য। তার অপরাধ ছিল হাইওয়ে রোডে ভ্যান নিয়ে যাওয়া। বাস স্ট্যান্ডে যদি একজন ভ্যান চালক ভ্যান নিয়ে না যেতে পারে তাহলে যে সকল যাত্রীরা ভারী কোনো মালামাল নিয়ে কোথাও যেতে চায় তারা চলাচল করবে কিভাবে? এভাবে কি একটি সমস্যার সমাধান করা সম্ভব? সড়ক দুর্ঘটনা বা যানজটের জন্য কি সি.এন.জি/অটো রিক্সা দায়ী? নাকি চালকদের অসচেতনতা ও

দায়িত্বহীনতা বেশি দায়ী?

তবে কারণ যাই হোক না কেন অটো রিক্সা বা সি.এন.জির ক্ষেত্রে সরকারি এ সিদ্ধান্তের ফলে জনগণ যে ভোগান্তির শিকার হচ্ছে তা হয়তো মন্ত্রী মহোদয় বা রাষ্ট্রের কর্তাব্যবুরা জানেন না। বিশেষ করে মহিলা যাত্রীদের বাসের ভিড়ে চিড়ে চ্যান্টা হয়ে চলাচল যে কত সুখের তা একমাত্র ভুক্তভোগীরাই জানেন। যারা স্কুল-কলেজে লেখা-পড়া করে তারা হয়তো নিজেদেরকে মানিয়ে নিতে পারে; কিন্তু যে সকল মেয়েরা বাচ্চা নিয়ে বা অসুস্থতার কারণে কোথাও যেতে চায় তারা পড়েন বিপাকে। প্রচণ্ড ভিড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা তাদের জন্য কষ্টদায়কই বটে। আবার ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক পুরুষেরা মেয়েদের গায়ের সাথে গা মিশিয়ে যেতে বাধ্য। এতে অনেকের জন্য বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এরচেয়েও বেশি সমস্যা এক কিলোমিটার বা দু' কিলোমিটার রাস্তার ক্ষেত্রে কোনো যাত্রীকে বাসে তোলা হয় না। বিপদে পড়ে পুরুষ মানুষ না হয় ঐটুকু রাস্তা হেঁটে পাড়ি দিবে; কিন্তু বয়স্ক নারী-পুরুষ, রোগী, ছোট বাচ্চা ও তার মা এদের পক্ষে কি হেঁটে চলাচল করা সম্ভব? তাহলে এদের জন্য বিকল্প কোনো ব্যবস্থা না করে হঠাৎ এ সিদ্ধান্ত নেয়াটা কতটুকু যুক্তিযুক্ত হয়েছে? তৃণমূল পর্যায়ের প্রতিটি চিত্র যদি সরকার সঠিকভাবে অবহিত না হয় তাহলে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকার সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করবে এটাই স্বাভাবিক। সি.এন.জি বা অটো রিক্সার ক্ষেত্রে সরকারি এ সিদ্ধান্ত যে জনগণের ভোগান্তি বাড়িয়েছে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

যাত্রীদের ভোগান্তির যৎসামান্য আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে; এবার দেখা যাক অটো রিক্সা/সি.এন.জি চালক বা মালিকদের কি অবস্থা। বাংলাদেশে অন্তত এক কোটির উপরে সি.এন.জি বা অটো রিক্সা রয়েছে। এর মালিক বা চালকরা এর দ্বারা যে আয়-রোজগার হয় তা-ই দিয়ে সংসারের ব্যয়ভার বহন করে। কিন্তু সরকারি এ সিদ্ধান্তের ফলে তাদের আয়ের পরিমাণও অনেকটা কমে

সরকার রাস্তার যানজট বা দুর্ঘটনা হ্রাস করার জন্য এ সিদ্ধান্ত নিলেও বাস্তবে তা তেমন কাজে লাগেনি। চালকদের বেপরোয়া গাড়ি চালানো ও ট্রাফিক আইন না মানার কারণে পূর্বের মতই দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। তাহলে

সরকারের অটো রিক্সা বা সি.এন.জির ক্ষেত্রে এ নিষেধাজ্ঞা আরোপের ফলে জনগণের ভোগান্তি বৃদ্ধি ছাড়া আর কী উপকার হলো? এটা কি সরকারের সফলতা, নাকি ব্যর্থতা? যারা সব সময় জনগণের সুখ-শান্তির বুলি আওড়ায় তারাই আবার এমন সিদ্ধান্ত নেয় যা দ্বারা সাধারণ জনগণ ভোগান্তির শিকার হয়। জানি না এটা কোন বুদ্ধিমানের কাজ, নাকি নির্বুদ্ধিতা। তবে সরকার যদি সাধারণ জনগণের চলার ক্ষেত্রে বিকল্প কোনো ব্যবস্থা করে দিয়ে তারপর এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতো তাহলে অন্তত যাত্রীদের ভোগান্তির শিকার হতে হত না; আর তাদের নিকট থেকে বাহবাও পেত

গেছে। আগে যেখানে দৈনিক আয় হত ১০০০/১২০০ টাকা সেখানে বর্তমানে আয় হচ্ছে ৪০০/৫০০ টাকা। আগের আয়ের চেয়ে বর্তমান আয়ের পরিমাণ অর্ধেকেরও কম। যা থেকে গ্যাস ত্রুণ ও অন্যান্য খরচ বাদ দিলে সংসার খরচের জন্য খুব বেশি অর্থ থাকে না। অনেকেই আবার সারাদিন সি.এন.জি চালিয়ে সংসারের খরচ যোগাড়

করতেও ব্যর্থ হচ্ছে। তাই তারা সংসার পরিচালনার জন্য এর পাশাপাশি অন্য পন্থায় আয়-রোজগারের চিন্তা-ভাবনা করছে। যারা তা করতে পারছে তাদের কোন সমস্যা নেই; কিন্তু যারা অন্য কোন কর্মসংস্থান করতে পারেনি তার কী করবে? তাদের মধ্যে অনেকেই মানবেতর জীবন-যাপন করছে, আবার অনেকেই হয়তো বাধ্য হয়ে সংসারের ব্যয়ভার বহনের জন্য চুরি-ছিনতাইয়ের মত অনৈতিক কর্মে লিপ্ত হচ্ছে। একটি মাত্র সরকারি সিদ্ধান্ত, অথচ এর ভোগান্তির শিকার লক্ষ লক্ষ মানুষ।

সরকার রাস্তার যানজট বা দুর্ঘটনা হ্রাস করার জন্য এ সিদ্ধান্ত নিলেও বাস্তবে তা তেমন কাজে লাগেনি। চালকদের বেপরোয়া গাড়ি চালানো ও ট্রাফিক আইন না মানার কারণে পূর্বের মতই দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। তাহলে সরকারের অটো রিক্সা বা সি.এন.জির ক্ষেত্রে এ নিষেধাজ্ঞা আরোপের ফলে জনগণের ভোগান্তি বৃদ্ধি ছাড়া আর কী উপকার হলো? এটা কি সরকারের সফলতা, নাকি ব্যর্থতা? যারা সব সময় জনগণের সুখ-শান্তির বুলি আওড়ায় তারাই আবার এমন সিদ্ধান্ত নেয় যা দ্বারা সাধারণ জনগণ ভোগান্তির শিকার হয়। জানি না এটা কোন বুদ্ধিমানের কাজ, নাকি নির্বুদ্ধিতা। তবে সরকার যদি সাধারণ জনগণের চলার ক্ষেত্রে বিকল্প কোনো ব্যবস্থা করে দিয়ে তারপর এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতো তাহলে অন্তত যাত্রীদের ভোগান্তির শিকার হতে হত না; আর তাদের নিকট থেকে বাহবাও পেত। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে অটো রিক্সা বা সি.এন.জি মালিক-শ্রমিকরা যতটা না সমস্যার সম্মুখীন তার চেয়ে যাত্রীরা কয়েকগুণ বেশি ভোগান্তির শিকার। হোক না যাত্রীদের ভোগান্তি তাতে তো সরকারের কোন ক্ষতি হবে না; কারণ এরা যে জনগণের সেবায় নিয়োজিত সরকার। তাই জনগণকে সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরিয়ে দিতে না পারলেও সমস্যায় ফেলতে অসুবিধা কী! এরা তো পাঁচ বছরের ম্যাডেট নিয়েই এসেছে। তাই কালক্ষেপণ না করে আসুন আমরাও ডিজিটাল গতিতে দশ বছর পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাই।

নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস, ওপারেতে সর্ব সুখ আমার বিশ্বাস!

মারজানা ইসরাত



আমার পর্দা পরিপালনের ব্যাপারে
তেমন সমস্যা হয়নি!

কিন্তু যেদিন আমি বাসায় বললাম
আমাকে হাত মোজা/পা মোজা কিনে
দাও সেদিন আমার নিকটজনেরাই
বলেছিল আমি নাকি এটা ধরে রাখতে
পারব না। তাই এখনই এসবের
দরকার নেই। শুধু আমার বাবা সাপোর্ট
দিয়েছিল। আমার জেদের কারণে
অবশেষে আমার বোন আমাকে মোজা
কিনে দিয়েছিল। কিন্তু খুব অনিচ্ছাতে।

শুরু হলো আমার নতুন জীবন!
নতুন জীবন বলছি এজন্য যে, তখন
থেকেই আমার জীবনে, আমার চিন্তা
ভাবনায়, আমার স্বপ্নে অদ্ভুত রকমের
পরিবর্তন এসেছে! যেদিন কলেজে
গেলাম প্রথম, সেদিন রেজিস্ট্রেশন না
কী যেন একটা কাজ ছিল। আঠা দিয়ে
কী যেন একটা জোড়া লাগানোর জন্য
বলা হচ্ছিল! আমার হাতে তো মোজা
পরা। কীভাবে কী করব। এক ফ্রেডকে
ডাকতে যাব, ঠিক তখন ডিপার্টমেন্টের
মামা বলল, এই যে! আমার কাছে দেন
লাগিয়ে দেই! আমি খুব অবাক হলাম।
কারণ মামা কখনো ভাল ব্যবহার করে
না, কিছু জানতে চাইলেই ধমকে কথা
বলে! আর সে কিনা আজ নিজে থেকে
সাহায্য করতে এগিয়ে এলো! পর্দার
প্রতি উৎসাহ আরও বেড়ে গেল।

তখনও আমার পরিবার এই ধারণায়
ছিল, আমি শেষ পর্যন্ত পারব না।
প্রচণ্ড গরম পড়ছিল তখন। আল্লাহ
আমাকে সাহায্য করেছিলেন বলেই
হয়ত আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।
আমি জানি, আমার পর্দায় সবচেয়ে
বেশি খুশি ছিলেন আমার বাবা। কিন্তু
একদিন বাইরে যাব বলে রেডি
হচ্ছিলাম। ভর দুপুর। গরমটা সেদিন
একটু বেশিই ছিল। বাবা আমার দিকে
বিস্ময় দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন। হঠাৎ
বলে উঠলেন,
মোজা পরার দরকার কী? আজকে
অনেক গরম। আর কিছুদিন যাক, পড়ে
না হয় পরিস?
আমি কান্নাকাটি শুরু করে দিলাম।
বাবার কাছ থেকে এমন কথা কখনো

পরিচিত অপরিচিত দীনি বোনেরা
সবসময়ই বলে, “মারজান, তোমার
কত সুবিধা! পর্দা করাতে তোমার
কোনো বাধাই আসে না পরিবার থেকে!
অথচ আমাদের কত বাধা!”

এতদিন এগুলো শুনে শুধু
হেসেছি... বলিনি কিছু। আমার
হাসিটাকে বোনেরা পরিতৃপ্তির হাসি
ভেবেছেন। এতে তাদের নিজের
অবস্থানের প্রতি হতাশাটা আরও
বেড়েছে!

এখানে আমার নিজের জীবনের কিছু
কথা শেয়ার করব ইনশা'আল্লাহ।
নিজেকে বড়/ছোট/সম্মানিত/অপমানিত
করার উদ্দেশ্যে নয়। উদ্দেশ্য যারা
নিজের অবস্থানের জন্য হা-হতাশ

করেন তাদের ইন্সপায়ার্ড করা।

এ যুগের অন্য দশটা পরিবার থেকে
আমার পরিবার একটু ভিন্ন তা মানতেই
হবে। পরিবারে দাদাজান/নানাজানের
তৈরি করা পরিবেশ এখনো বিরাজমান!
আমার মা'র ফ্যামিলি, বাবার ফ্যামিলি
সবারই আলহামদুলিল্লাহ দীনের বুঝ
আছে। কারো কম, করো বেশি।

ছোট থেকেই আমরা ভিন্ন পরিবেশ
পেয়েছি! বাইরের লোকদের সাথে কম
মেলামেশা, চাচাত/খালাত ভাইদের
সাথে দূরত্ব, যেকোন অকেশনে বোরকা
পড়ে যাওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি। তাই
আপাতদৃষ্টিতে মনে হওয়ারই কথা—

আশা করিনি। আমার পরিবার তো দীন বুঝে। তবু কেন এসব বলবে? বাইরে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে মাকে ফোন দিয়ে সব বললাম। এও বলে দিলাম— কাল থেকে হিজাব ছাড়াই বাইরে যাব। তখন তোমাদের কেমন লাগে দেখব। মা বলল, এই गरমে আমার পোশাক দেখে বাবার নাকি মায়া লাগছিল আমার জন্য।

রাতে খুব শান্তভাবে বাবা কে বললাম, আমি যেহেতু তোমার আদরের মেয়ে তাই আমার কষ্টে মায়া লাগাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যেদিন বেপদার কারণে তোমার সামনে আল্লাহ আমাকে জাহান্নামে পুড়াবে সেদিন কিভাবে সহ্য করবো? বাবা মিটিমিটি হাসল!

মাঝে মাঝে দূর দূরান্ত থেকে দীনি বোনেরা আমার সাথে দেখা করতে আসে এবং তাদের নিয়ে দ্বীনি আলোচনায় বসি এটা আমার বাসায় জেনে যায়। রিভার্টেড কিছু বোনের সাথে আমার পরিচয় এটাও জেনে যায়। মা ফোন করে বলল, তুই পড়াশোনা বাদ দিয়ে বাড়িতে চলে আয়।

তুই যা শুরু করেছিস তার জন্য তো বিপদে পড়বিই, তোর ভাই-বোনদেরও বিপদে ফেলবি। তোর জন্য তোর ভাই-বোন কেন বিপদে পড়বে? তার চেয়ে বাড়ি চলে আয়। বিপদ-আপদ আমাদের উপর দিয়ে যাক...!

খুব কষ্ট পেয়েছিলাম কথাগুলো শুনে! সবদিক থেকে প্রেশারে আমি দিশেহারা। বড় বোনও ফোন করে অনেক কিছু বলল। বাসাতেও আপুরা ঠিকমত কথা বলে না। শেয়ার করার মত কেউ নাই। চুপচাপ থাকতে হয় সারাদিন। ওয়ু করে সিজদায় পড়ে কেঁদেছি। এতদিনের দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা, একাকিত্ব এবার একসাথে প্রকাশ পেল। প্রচন্ড খিচুনি শুরু হলো আমার। আমি তখন সেপ্লেস। আপুরা নাকি অসম্ভব ভয় পেয়েছিল আমার অবস্থা দেখে। কোনরকম আমাকে ওয়াশরুমে নিয়ে ফ্লোরে ফেলেই পানি ঢালতে

লাগল। কতক্ষণ এভাবে ছিলাম জানি না। চোখ খুলে দেখি ভয়ার্ত তিনটা মুখ। তখনো পানি ঢালছেই। আমি তো আল্লাহর কাছে আমার দুঃখ সমর্পণ করছিলাম আমার এ অবস্থা কেন? বুঝতে সময় লাগল। যাক! এ ঘটনার পর আমাকে নিয়ে আর তেমন কিছু কেউ বলত না। আমার কষ্টটা ছিল— আমার পরিবার তো দীন বুঝে। তারা কেন অযথাই আমাকে নিয়ে চিন্তা করবে? তারা তো বরং আমাকে রক্তচক্ষু দেখিয়ে বলবে, খবরদার! কোন গায়রে মাহরাম যেন তোকে না দেখে।

খবরদার! রাস্তায় চোখ নীচু করে হাঁটবি।

খবরদার! ইবলিসের দুষমনির উপর তোর ঈমানকে জয়ী হতেই হবে...। আর তা না বলে দেশের পরিস্থিতির জন্য আমাকে নিয়ে চিন্তা করে আমার বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

মাঝে মামাদের বিয়ে ছিল। এক সপ্তাহের মাঝে দুই মামার বিয়ে! সব আত্মীয় স্বজন নানুবাড়িতে। বহু বছর পর মেঝো খালামনি, খালাত বোন, ভাই-ভাবি আমেরিকা থেকেও আসলো। মেঝো খালামনি যেহেতু অতিমাত্রায় পর্দাশীল তাই আমার জন্য

একটু সুবিধাই হলো। কিন্তু তবু কাজিনদের কিছু কথা আমাকে প্রতি মুহূর্তেই কাঁদাচ্ছিল।

সবাই এতদিন পর একসাথে। রাতে গেট টুগেদার পার্টি! বিয়ের আমেজ। সাজুগুজুর প্রস্তুতি। সবাই মিলে গোলাপ, রজনীগন্ধা, বেলি দিয়ে দুই মামার ঘর সাজানো। বিশাল আনন্দ!!

আমি মা-খালামনিদের সাথে বসে, শুয়ে, ঘুমিয়ে সময় কাটাচ্ছি। তবু ভাল লাগছিল। কিন্তু কোনো ভাই আসলেই যখন মুখ ঢেকে ফেলতাম তখন বলত, যাও যাও... এখানে কেন তুমি? পর্দা করো গিয়ে। কেউ বা বলে এতদিন পর দেখা, কোথায় সবাই মিলে আনন্দ করব, আবার কবে না কবে দেখা

হয়, তা না! উনি নাকি পর্দা করে!

আমার দু'তিন বছরের ছোট খালাত ভাইটা তো রাগ করে একজনকে দিয়ে খবর পাঠাল—

“আপুর সাথে আর জীবনেও কোনদিন কথা বলব না। আমি তার ছোট ভাই আর আমার সাথেও তার পর্দা!”

বিয়ে বাড়ি। কাঁদতেও পারছিলাম না। কাঁথা দিয়ে মাথা ঢেকে চুপিচুপি কান্না করতাম। মামি, খালামনি, বউমনি ডাকলে বলতাম মাথা ব্যথা, খুব ব্যথা!

তারপর যখন পাশের বাসার কেউ মাযারের মিলাদ, উরশের কোনো খাবার দিত অথবা কোনো হিন্দু যদি পূজার প্রসাদ দিত, বা সুদ খায় এমন কেউ যদি কোন খাবার পাঠাত বাসায় আমি খেতাম না। এটা নিয়ে আমার আপুরা কম টিজ করত না। আমার বাবা-মা তো আলহামদুলিল্লাহ এতটা বছর হালাল খাবার মুখে তুলে দিয়েছে। সেখানে জেনেশুনে হারাম খাবার মুখে দেই কী করে। এজন্য কথাও শুনতাম। ওলী হয়ে গেছিস নাকি? ছোট ভাইটা ডাকত ওলী আপা!

বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়

মানসিক রোগাক্রান্ত জাতির স্বপ্নচারী একজন হুমায়ুন আহমেদের গল্প

ইবনু আদিল্লাহ মুহাম্মাদ আদিল



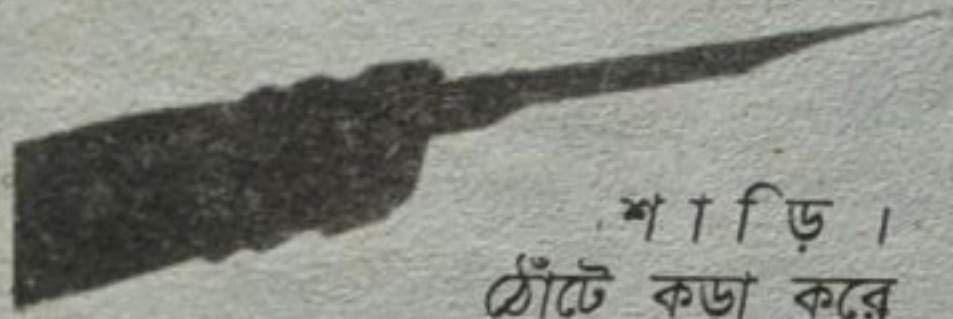
৩২ বছরের সুদীর্ঘ সাংসারিক বন্ধন ছিন্ন হবার কারণ ঘাটলে যা পাওয়া যায়, তাকে একবাক্যে বললে পরকীয়া বলা যেতে পারে। তার বেশিরভাগ গল্প-উপন্যাসের মূল চরিত্র কিশোরী। নাটকেও তা-ই। নবযৌবনপ্রাপ্ত মেয়েদের সরল আবেগই ছিল স্যারের মূল পুঁজি। বাস্তব জীবনও এর ব্যতিক্রম নয়। দশক নব্বইয়ের উঠতি তারকা এবং ছোট মেয়ে শীলার বান্ধবী মেহের আফরোজ শাওনের সাথে অবৈধপ্রণয় সর্বদাই প্রশ্নের সম্মুখীন করে রেখেছে স্যারকে। টাঙ্গাইলের সেই 'আউটডোর ক্রাইম' এর কথা আজও মনে আছে জাতির। শাওনের সাথে স্যুটিংয়ের ফাঁকে 'টাইমপাস' যখন বিছানা পর্যন্ত গড়ায় খবর পেয়ে স্ত্রী গুলতেকিন স্যুটিংস্পটে ছুটে গিয়ে কী তুলকালাম ঘটিয়েছিলেন তা কি ভুলে যাবার মতো ঘটনা? স্ত্রী গুলতেকিন বলেন, ষোড়শী তরুণীদের প্রতি বরাবরই তার আসক্তি ছিল। মেয়েদের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে প্রশ্ন করলেই আমাকে নির্যাতিত হতে হতো।

১ ৩
নভেম্বর।
জুমাবার। সাপ্তাহিক ছুটির দিন। আমার মতো লোকদের সাপ্তাহিক কাজের দিনও বলা চলে। সারা সপ্তাহের কাজের ফিরিস্তি হাতে। ফজর পড়েই বেরিয়ে পড়লাম। পত্রিকা কতদিন পড়া হয় না- হিসেব রাখিনি। নেটেও টু মারার সময় নেই। যান্ত্রিক ক্রটির কারণে বুরকান হাতে আসতে দেরি হচ্ছে। চতুর্দিক থেকে মেসেজের পর মেসেজ।
আবেগমাখা অনুরোধ-উপদেশ। রিপ্লাই দেবারও সাহস পাচ্ছি না।
একবার প্রেসে, তো আরেকবার অফিসে। ক্যাম্পাসে ফিরতে ফিরতে রাত প্রায় দুপুর। একটু ভিন্ন আমেজ অনুভব করছি ঢোকান সাথে সাথেই। চারিদিক আলোকিত। হয়তো কিছু একটা হচ্ছে। ঘটা তো সবসময় লেগেই থাকে। দিবসের শেষ আছে নাকি? বানিয়ে নিতেই বা বাধা কোথায়? হলের সামনেই পেয়ে গেলাম আহসানকে। বাসায় যাবে বলেছিল। এখানেই অপেক্ষা করতে বলেছিলাম। 'কিরে, আজ আবার কার শ্রাদ্ধ?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'শ্রাদ্ধ না ভাই, জন্মদিন।'
-কার রে?
বলেন, কয়দিন
-আগে পত্রিকা পড়েন না?
-তা পরে বলছি ক্যালকুলেশন করে।
বল্ কার?
-হুমায়ুন স্যারের!
এরপর বাসায় পৌছা পর্যন্ত অনবরত বলেই যাচ্ছিল-

"হুমায়ুন স্যার বাংলা সাহিত্যের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছেন। ব্যবহারিক জীবনের প্রতিটি কাজেও ছিল তার সাহিত্যের ছোঁয়া। দুই শতাধিক গল্প-উপন্যাস। সফল সাহিত্যিকের সংজ্ঞায় বাংলায় কেউ উত্তীর্ণ হলে সেটা হবেন একমাত্র হুমায়ুন স্যার। ধর্মকর্মের প্রতিও ছিল তার প্রবল আগ্রহ...!"

নিশুপ শুনাই যাচ্ছিলাম। বাসায় পৌছে বুকশেলফের নীচ থেকে একটা বই বের করলাম। মেঘের ছায়া। হুমায়ুন স্যারের। ৮৬ নং পৃষ্ঠা বের করে বললাম, 'এখান থেকে পড়ো।' প্রিয় স্যারের বই। আহসান পূর্ণ মনোযোগের সাথে পড়তে লাগলো-
"...নীতু আজকে সত্যি সত্যি সেজেছে। তার গায়ে লাল সিল্কের



শা ডি ।

ঠোটে কড়া করে
লাল লিপস্টিক দেয়া ।

শুভ কখনো নীতুর ঠোটে লিপস্টিক
দেখেনি । ... (নীতু বলল) তারপর ঠিক
করলাম তুমি যখন আসবে তোমাকে
বলব, আমার শরীরটাই তো তোমার
দরকার । বেশতো, শরীরটা কিছুক্ষণের
জন্য তোমাকে দেব । তার বদলে মোটা
কিছু অংকের টাকা তুমি আমাকে দাও ।

...শুভ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ।
নীতু বলল, কথা বলছ না কেন? তুমি
চাইলে আমি সব কাপড় খুলে ফেলতে
পারি । ঘরেও কেউ নেই । তবুও
তোমার কাছে যদি মনে হয় ঘর বেশি
আলো তাহলে আমি জানালা বন্ধ করে
দিতে পারি । শুভ কিছু বলার আগেই
নীতু উঠে জানালা বন্ধ করে দিলো । ঘর
আবছা অন্ধকার হলো । নীতু বলল,
অন্যদিকে তাকাও শুভ । নগ্ন হয়ে
প্রেমিকের সামনে আসা কঠিন নয় ।
কিন্তু প্রেমিকের সামনে নগ্ন হওয়া বেশ
কঠিন । [মেঘের ছায়া, হুমায়ুন
আহমেদ, পৃঃ ৮৬-৮৮]

এবার আমি শুরু করলাম-

...এই হলো স্যারের সাহিত্য চার্চার
কিয়দাংশ । চুম্বকাংশও বলা যেতে
পারে । এক সময় 'হুমায়ুন-ভক্ত'
ছিলাম । কিন্তু বুঝতাম, এসব আমাকে
বাস্তবজীবন থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে ।
একটা কাল্পনিক জগতে নিয়ে যাচ্ছে ।
যে জগতের কোন উদ্দেশ্য নেই । আছে
শুধু 'অহেতুক' কল্পনা । লেখার মধ্যে
'যৌনতা' না থাকলে পাবলিক বিশেষ

করে 'ইয়াং
জেনারেশন' খায় না ।

হুমায়ুন আহমেদ স্যাররা এটাকে
ভালভাবেই ব্যবহার করেছেন । এটা
অবশ্য তার নিজেরই কথা, তিনি
উপন্যাস লিখতেন টাকা-পয়সার জন্য!
আহসানের চোখ ততক্ষণে চড়কগাছ ।
গর্জে উঠল-

"না ভাইয়া, শেষের কথাটার সাথে
একমত হতে পারছি না । স্যার অত্যন্ত
সাদামাটা স্বভাবের ছিলেন । সম্পদের
মোহ তো মোটেই ছিল না..."

আবারও উঠে গিয়ে একটা বই বের
করে আনলাম । স্যারের লেখা-
বলপয়েন্ট । ৭৯ পৃষ্ঠা খুলে পড়তে
বললাম । আহসান পড়তে লাগল-

"...এইসব দিনরাত্রি ধারাবাহিক
নাটকটি প্রচার হওয়ার পর এক
সাংবাদিক জানতে চাইলেন, এই
ধারাবাহিকটি লেখার পিছনে আপনার
মূল প্রেরণা কী ছিল? আমি বললাম,
অর্থ-উপার্জন । আমার একটি রঙিন
টিভি কেনার প্রয়োজন ছিল বলেই
ধারাবাহিক নাটকটি লিখেছি ।"

[বলপয়েন্ট, হুমায়ুন আহমেদ, পৃঃ ৭৯]
আমি আবার শুরু করলাম-

...হিমু সিরিজ পড়ে অনেকেই মানসিক
হসপিটালে ভর্তি হয়েছে । আশ্চর্য হচ্ছে?
এটাই বাস্তব । হুমায়ুন আহমেদের বই
থেকেই নেয়া । তিনি অবশ্য এতে
'গর্ববোধ' করেছেন যে, তার লেখা
পড়ে মানুষ 'মানসিক রোগী' হচ্ছে!

আহসানকে আমি যতদূর জানি, শোনার
চেয়ে তার বলার যোগ্যতা অনেক
বেশি । কিন্তু আজ ব্যতিক্রম লক্ষ্য
করছি । ও শুনতে চাচ্ছে আজ । আমিও
সুযোগের সদ্ব্যবহারের চেষ্টা চাললাম ।

বলতে লাগলাম,

...দেখো হুমায়ুন স্যার আমার দেশি
মানুষ । বহু কবি-সাহিত্যিক,
ত্যাগী-সংগ্রামীর জন্মভূমি আমাদের
নেত্রকোণা জেলা । স্যারের বাড়ি আমার
পাশের উপজেলা কেন্দুয়ার কুতুবপুরে ।
জন্ম- ১৩ নভেম্বর, ১৯৪৮ । পিতা-
ফয়জুর রহমান । মাতা- আয়েশা
ফয়েজ । জন্মের পর স্যারের বাবা তার
নাম রেখেছিলেন- শামসুর রহমান ।
ডাকনাম ছিল- কাজল । চট্টগ্রামে
থাকাকালীন বাচ্চু নামে পরিচিত ছিলেন
তিনি । তার বাবার অভ্যাস ছিল-
সন্তানদের নাম বারবার পরিবর্তন করা ।
স্যারের ছোট ভাই জাফর ইকবালেরও
পূর্বের নাম ছিল বাবুল । স্যার ১৯৭৩
সালে প্রথম বিয়ে করেন । স্ত্রীর নাম
গুলতেকিন । সংসার করেন ২০০৫
পর্যন্ত । ৩২ বছরের সংসারে স্যারের ৩
মেয়ে, ২ ছেলে । মেয়েরা হলো-
বিপাশা, নোভা ও শীলা । ছেলে-
নুহাশ । অপর এক ছেলে অপরিণত
বয়সেই মারা যায় ।

৩২ বছরের সুদীর্ঘ সাংসারিক বন্ধন ছিন্ন
হবার কারণ ঘটলে যা পাওয়া যায়,
তাকে একবাক্যে বললে পরকীয়া বলা
যেতে পারে । তার বেশিরভাগ
গল্প-উপন্যাসের মূল চরিত্র কিশোরী ।
নাটকেও তা-ই । নবযৌবনপ্রাপ্তা
মেয়েদের সরল আবেগই ছিল স্যারের
মূল পুঁজি । বাস্তব জীবনও এর
ব্যতিক্রম নয় । দশক নব্বইয়ের উঠতি
তারকা এবং ছোট মেয়ে শীলার বান্ধবী
মেহের আফরোজ শাওনের সাথে
অবৈধপ্রণয় সর্বদাই প্রশ্নের সম্মুখীন
করে রেখেছে স্যারকে । টাঙ্গাইলের
সেই 'আউটডোর ক্রাইম' এর কথা
আজও মনে আছে জাতির । শাওনের
সাথে স্যুটিংয়ের ফাঁকে 'টাইমপাস'
যখন বিছানা পর্যন্ত গড়ায় খবর পেয়ে
স্ত্রী গুলতেকিন স্যুটিংস্পটে ছুটে গিয়ে
কী তুলকালাম ঘটিয়েছিলেন তা কি
ভুলে যাবার মতো ঘটনা? স্ত্রী
গুলতেকিন বলেন, ষোড়শী তরুণীদের
প্রতি বরাবরই তার আসক্তি ছিল ।
মেয়েদের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে প্রশ্ন
করলেই আমাকে নির্যাতিত হতে
হতো ।

এভাবেই বইয়ের পাতায় সাহিত্যের রং

মাথা যে সুখী রাজকুমার হুমায়ুন আহমেদের কল্পনা আমরা করেছি- আসলে সাংসারিক, পারিবারিক এমনকি জীবনের প্রতিটি অঙ্গনেই তিনি ছিলেন চরম অসুখী। অবশেষে 'তালাকবিচ্ছেদ' এর মাথা খেয়ে ২০০৫ এ স্ত্রী গুলতেকিনকে তালাকনামা ধরিয়ে দিয়ে বিদায় করেন। আর সাথে সাথে বিয়ে করে নেন ছোট মেয়ের বান্ধবী শাওনকে...।^১

আহসান একটু নড়েচড়ে বসলো। একটু জিরিয়ে নিয়ে এবার একটু থিওরিটিক্যাল ভাবে শুরু করলাম- ...মক্কার কাফেররা যখন মানুষকে প্রতিমধুর 'কুরআন' শোনানো থেকে বিরত রাখতে হুমকি-ধমকি দিয়েও কাজ হচ্ছিল না; তখন তারা পাশের পারস্যের রাজ-রাজাদের কাহিনী এনে শোনাতে লাগল, যাতে মানুষকে অলটারনেটিভ কিছু দেয়া যায়, ব্যস্ত রাখা যায়।

মক্কার এক মুশরিক ব্যবসায়ী নযর ইবনে হারেস বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশ সফর করত। সে একবার পারস্য দেশ থেকে কিসরা প্রমুখ আজমী সম্রাটদের ঐতিহাসিক কাহিনীর বই কিনে আনল এবং মক্কার মুশরিকদের বলল, "মুহাম্মদ তোমাদেরকে আদ, সামুদ প্রভৃতি সম্প্রদায়ের কিসসা-কাহিনী শোনায়। আমি তোমাদেরকে রুস্তম, ইসফেন্দয়ার প্রমুখ পারস্য সম্রাটদের সেরা কাহিনী শোনাই। মক্কার মুশরিকরা অত্যন্ত আগ্রহভরে তার আনীত কাহিনী শুনতে থাকে। কারণ এগুলোতে শিক্ষা বলতে কিছু ছিল না, যা পালন করতে শ্রম স্বীকার করতে হয়; বরং এগুলো ছিল চটকদার গল্পগুচ্ছ। এর ফলে অনেক মুশরিক, যারা এর আগে কুরআনের অলৌকিকতা ও অদ্বিতীয়তার কারণে একে শোনার আগ্রহ রাখত এবং গোপনে শুনতও, তারাও কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার ছুতা পেয়ে গেল। [তাকসীর মাআরেফুল কোরআন, পৃঃ ১০৫২; সূরা লুকমান আয়াত ৬ এর তাকসীর]

আল্লাহ আমাদেরকে
অশ্লীল বাক্য বলা,
লিখা এবং প্রচার করা
থেকে দূরে রাখুন।
আমীন।

নযর ইবনে হারেসরা যা করেছিল তখন, হুমায়ুন আহমেদরা তা করে যাচ্ছে এখন। আমি বলছি না, তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে করেছেন। হয়ত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে, বা শয়তানের ধোঁকায় পড়ে, অথবা নিজের কুপ্রবৃত্তির তাড়নায়, কিংবা একটা টিভিসেট কিনার জন্য, কিংবা জনপ্রিয় হওয়ার জন্য! এদের কথাই আল্লাহ কুরআনে বলেছেন, যুগে যুগে যারা নযর ইবনে হারেসদের মতো কাজ করবে-

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

একশ্রেণির লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিপথগামী করার উদ্দেশ্যে অন্ধভাবে অবান্তর কথাবার্তা সংগ্রহ করে এবং ওগুলোকে গ্রহণ করে ঠাট্টা-তামাশারূপে। এদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি। [আল-কুরআন, ৩১: ৬]

শুরুর অশ্লীল কথাগুলো উল্লেখ করার জন্য দুঃখিত! আসলে স্যারের লেখা থেকে সামান্য উদ্ধৃতিও না টেনে এত কথা বললে পাঠক ভাবতেন, আমি বুঝি পায়ে পাড়া দিয়ে তর্ক করছি। তারা কিভাবে 'সাহিত্যের' ছদ্মবেশে অশ্লীলতা প্রচার করছে তা-ও বোঝানো সম্ভব ছিল না।

দুঃখ আমাদের জন্যও, আমরা কুরআনকে মানুষের কাছে 'সঠিকভাবে' পৌছাতে পারিনি। অশ্লীল, যৌন সুড়সুড়ি দেয়া 'সাহিত্যের' বিপরীতে এমন 'সাহিত্য জগত' তৈরি করতে পারিনি কিংবা প্রচার করতে পারিনি যা আমাদেরকে স্রষ্টার নিকটে নিয়ে যাবে, বাস্তব জীবনে ফিরিয়ে আনবে, সত্যের কাছাকাছি নিয়ে যাবে, কাল্পনিক জগতে

নিয়ে যাবে না, হাসপাতালে 'মানসিক রোগীতে' রূপান্তর করবে না।

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الذِّمَرِ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

যারা মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে তাদের জন্য আছে দুনিয়া ও আখিরাতে পীড়াদায়ক শাস্তি এবং আল্লাহ জানেন তোমরা জান না। [আল-কুরআন, ২৪: ১৯]

প্রত্যেক অশ্লীল 'শব্দের' একটা ইফেক্ট আছে। এটা অনেকটা মাল্টিফ্লাইয়ার এর মতো, এক থেকে অন্যজনে ছড়িয়ে পড়ে, একসময় সমাজে এই অশ্লীলতাই গণ্য হয় শ্লীলতারূপে। যা হচ্ছে। প্রত্যেক ভাল কথাও একটা ইফেক্ট আছে, যা ছড়িয়ে পড়ে সমাজে, এক জন থেকে অন্যজনে।

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أَكْثَرَهَا كُلِّ حَسَنٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ

তুমি কি লক্ষ্য কর না আল্লাহ কীভাবে উপমা দিয়ে থাকেন? পবিত্রবাক্যের তুলনা একটি উৎকৃষ্ট বৃক্ষ, যার মূল সুদৃঢ় ও যার শাখা-প্রশাখা উর্ধ্বে বিস্তৃত। যা প্রতি মুহূর্তে ফলদান করে তার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে এবং আল্লাহ মানুষের জন্য উপমা দিয়ে থাকেন, যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে। মন্দবাক্যের তুলনা এক মন্দ বৃক্ষ, যার মূল ভূপৃষ্ঠ থেকে বিচ্ছিন্ন, যার কোন স্থায়িত্ব নেই। [আল-কুরআন, ১৪: ২৫-২৬]

আল্লাহ আমাদেরকে অশ্লীল বাক্য বলা, লিখা এবং প্রচার করা থেকে দূরে রাখুন। আমীন।

(Footnotes)

^১ পড়ুন আরও অজানা অনেক মজার কাহিনী-

www.cadetcollegeblog.com
/user/mokabbir/

আগুন!

শাইখ নাসির ইবনু হাম্মাদ আল-ফাহদ



শাইখ পা ভাঁজ করে বসলেন। স্বভাবসুলভ গান্ধীর সাথে আমামাহ ঠিক করলেন। তারপর ধীরে ধীরে তার চারপাশে বসে থাকা ছাত্রদের দিকে চোখ বুলালেন। তারা বসে ছিল স্থির চিন্তে, নিবিষ্ট মনে, মাটির দিকে চোখ নামিয়ে। যেন তাদের মাথায় পাখি বসে আছে, আর একটু নড়াচড়াতেই উড়ে যাবে।

শাইখ শুরু করলেন—

—হে বৎস! কাল আমরা কিতাবের কোথায় পৌঁছে ছিলাম?

“আমরা মুসান্নিফের এই বক্তব্য পর্যন্ত পৌঁছেছিলাম— ...জামাআহ হলো তাই, যা হকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যদি কেবল একজন সম্পূর্ণ সত্যকে স্বীকার করে, তবে সেটাই জামাআহ।”

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। আর আমি তোমাদের বলেছিলাম যে, হক হলো তা-ই যার উপর আমাদের এই জামাআহ আছে। আর যে আমাদের সাথে দ্বিমত করল, সে জামাআহ ত্যাগ করল। আর এভাবে সে দীনের মধ্যে বিদআহ সৃষ্টি করেছে এবং মুমিনদের রাস্তার বিপরীত চলে গেছে। আর...

হঠাৎ ভেসে আসা দরজায় আঘাতের শব্দে শাইখের কথায় বাঁধা পড়ল।

শাইখ কথা থামিয়ে একজন ছাত্রের দিকে তাকালেন। তৎক্ষণাৎ ছাত্রটি উঠে গিয়ে দরজা খুলল। দরজার ওপাশে দাঁড়ানো উষ্কখুস্ক চুলের, কালি মাখা মুখের লোকটি চোঁচাতে শুরু করল—

“ইয়া শাইখ! ইয়া শাইখ! আদিলের ঘরে আগুন লেগেছে, সব পুড়ে যাচ্ছে...”

শাইখ জায়গায় বসে মাথা ঘুরিয়ে শব্দের উৎসের দিকে তাকালেন। শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলেন—

—আর তাতে আমার কী?

—আমাদের এই মুহূর্তে আপনার এবং আপনার ছাত্রদের সাহায্য বড়ই প্রয়োজন হে শাইখ।

—তুমি চাও আদিলের অসতর্কতার কারণে, যে সমস্যায় সে পতিত হয়েছে, আমি তার সমাধান করি?

—শাইখ! বাসা ভর্তি নারী আর শিশু, এরা সবাই মারা পড়বে।

—এসবই আদিলের কর্মফল। সে নিজেই এই বিপদ ডেকে এনেছে।

এটুকু বলেই শাইখ তার ছাত্রের প্রতি ইশারা করলেন। উষ্কখুস্ক চুলের কালিমাখা লোকটির মুখের উপর দরজা

ইয়া শাইখ, আগুন মসজিদ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

শাইখ তার

স্বভাবসুলভ

গান্ধীর সাথে

লোকটির দিকে

তাকিয়ে আস্তে

আস্তে বললেন—

—আমি ঠাহর করতে

পেরেছিলাম এরকম

কিছু একটা ঘটবে।

কারণ এই মসজিদ

বিদআতিদের কাছ

থেকে নিজেকে রক্ষা

করতে ব্যর্থ হয়েছে।

আর বিদআতিরা

এই মসজিদে প্রবেশ

करेছে, সালাত

আদায় করেছে এবং

তাদের বিদআত

ছড়িয়ে দিয়েছে।

আর এই! তুমি

আমাদের যথেষ্ট

বিরক্ত করেছে।

আর এখানে আসবে

না।

বন্ধ হয়ে গেল। শাইখ আবার তার দারস শুরু করলেন—

—হে আমার সন্তানেরা! যেনে রাখো, যারাই আমাদের এই বরকতময় জামাআতের বিরুদ্ধে কথা বলে তারা গোমরাহ, বিদআতি এবং মন্দের অনুসরণকারী।

একজন ছাত্র প্রশ্ন করলো—

—যদি তারা আহলুস সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত হয়, তাও?

—কিভাবে তারা আহলুস সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে? তুমি কি এখনো বুঝতে পারছো না? কেউ আমাদের জামাআতের বিরোধিতা করার পরও কিভাবে আহলুস সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। বরং সে একজন বিদআতি। না, বরং সে আহলুল বিদআর চাইতেও নিকৃষ্ট, কারণ সে এমন সব ব্যক্তিদের তাবলিস করে যাদের বেশিরভাগ...

দরজায় করাঘাতের শব্দে আবাবো শাইখের কথায় ছেদ পড়লো। একজন ছাত্র উঠে গিয়ে দরজা খুলল।

চৌকাঠের ওপার থেকে সেই একই উষ্ণখুস্ক চুলের, কালিমাখা মুখের লোকটি আর্তনাদ করে উঠলো—

—শাইখ, আগুন সালিহের ঘর পর্যন্ত পৌছে গেছে।

—কোন সালিহ? বিদআতি সালিহ?

—শাইখ, যারা তার ঘরে আটকা পড়েছে তাদের আগুনের হাত থেকে বাঁচান, তারপর তাঁকে নসীহত করুন।

শাইখ বললেন,

—এটা হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে ত্বরিত শাস্তি সেই ব্যক্তির জন্য, যে বিদআত করেছে।

এক ছাত্রের দিকে দরজা বন্ধ করার ইশারা করে শাইখ আবার শুরু করলেন,

—দেখো, কিভাবে আল্লাহ এই বিদআতি খবিসকে শাস্তি দিয়েছেন। আল্লাহ একে শাস্তি দিয়েছেন, কারণ সে আহলুস সুন্নাহর পোশাকের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিল। কিন্তু যখন সে আমাদের বরকতময় জামাআতের বিরুদ্ধে কথা বলা শুরু করল, তখন আল্লাহ তার স্বরূপ প্রকাশ করে দিলেন এবং তিনি এই বিদআতির শাস্তি বৃদ্ধি করে দিয়েছেন, আর তাই এখন তার ঘর আগুনে পুড়েছে...

দেখো, কিভাবে আল্লাহ এই বিদআতি খবিসকে শাস্তি দিয়েছেন। আল্লাহ একে শাস্তি দিয়েছেন, কারণ সে আহলুস সুন্নাহর পোশাকের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিল। কিন্তু যখন সে আমাদের বরকতময় জামাআতের বিরুদ্ধে কথা বলা শুরু করল, তখন আল্লাহ তার স্বরূপ প্রকাশ করে দিলেন এবং তিনি এই বিদআতির শাস্তি বৃদ্ধি করে দিয়েছেন, আর তাই এখন তার ঘর আগুনে পুড়েছে...

অস্বস্তির সাথে নড়েচড়ে একজন ছাত্র বলল,

—কিন্তু শাইখ, আমি সালিহকে জানি, আর আমি তো তার মধ্যে কোনো বিদআত দেখিনি!

—হাহ! তুমি দেখনি। কারণ তুমি আল-জারহ ওয়াত-তা'দীল সম্পর্কে এখনও সম্পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে পারনি। আর তাই আমি তোমাকে বলছি, যে ব্যক্তি সুন্নাহর আড়ালে লুকিয়ে থাকে, সে প্রকাশ্য বিদআতির চাইতেও বেশি ভয়ঙ্কর। এই যে সালিহ, আমি তাকে বহুবার মসজিদে দেখেছি। সে আমার কুশলাদি জিজ্ঞেস করা তো দূরে থাক আমার দিকে তাকায় পর্যন্ত না! এমনকি সে আমাকে এড়িয়ে চলে।

—শাইখ, এটা কি কোনো বিদআহ?

—আলবৎ, যদি সে আমাদের বরকতময় জামাআতের সদস্য হত, তবে অবশ্যই আমাদের কুশলাদি জিজ্ঞেস করতো...

তৃতীয়বারের মত শাইখের কথায় বাধা পড়ল। দরজা খোলা মাত্র উষ্ণখুস্ক চুলে, কালিমাখা চেহারার লোকটি কান্না মিশ্রিত গলায় চিৎকার করে বলল,

—ইয়া শাইখ, আগুন মসজিদ পর্যন্ত পৌছে গেছে।

শাইখ তার স্বভাবসুলভ গাভীর সাথে

লোকটির দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বললেন—

—আমি ঠাহর করতে পেরেছিলাম এরকম কিছু একটা ঘটবে। কারণ এই মসজিদ বিদআতিদের কাছ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে। আর বিদআতিরা এই মসজিদে প্রবেশ করেছে, সালাত আদায় করেছে এবং তাদের বিদআত ছড়িয়ে দিয়েছে। আর এই! তুমি আমাদের যথেষ্ট বিরক্ত করেছে। আর এখানে আসবে না।

—ইয়া শাইখ! মসজিদ আগুনে পুড়ে যাচ্ছে!

—হোক মসজিদ। এসব কিছুর কারণ হলো আদিল। সে-ই এসবের জন্য দায়ী। তিনি ইশারায় তার ছাত্রদের দরজা বন্ধ করতে বললেন। শাইখ আবার তার কথা শুরু করলেন—

—দেখো, আহলুল বিদআহর গুনাহের ফলাফল। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। এমনকি মসজিদও তাদের বিদআতের অকল্যাণ থেকে রক্ষা পেলো না।

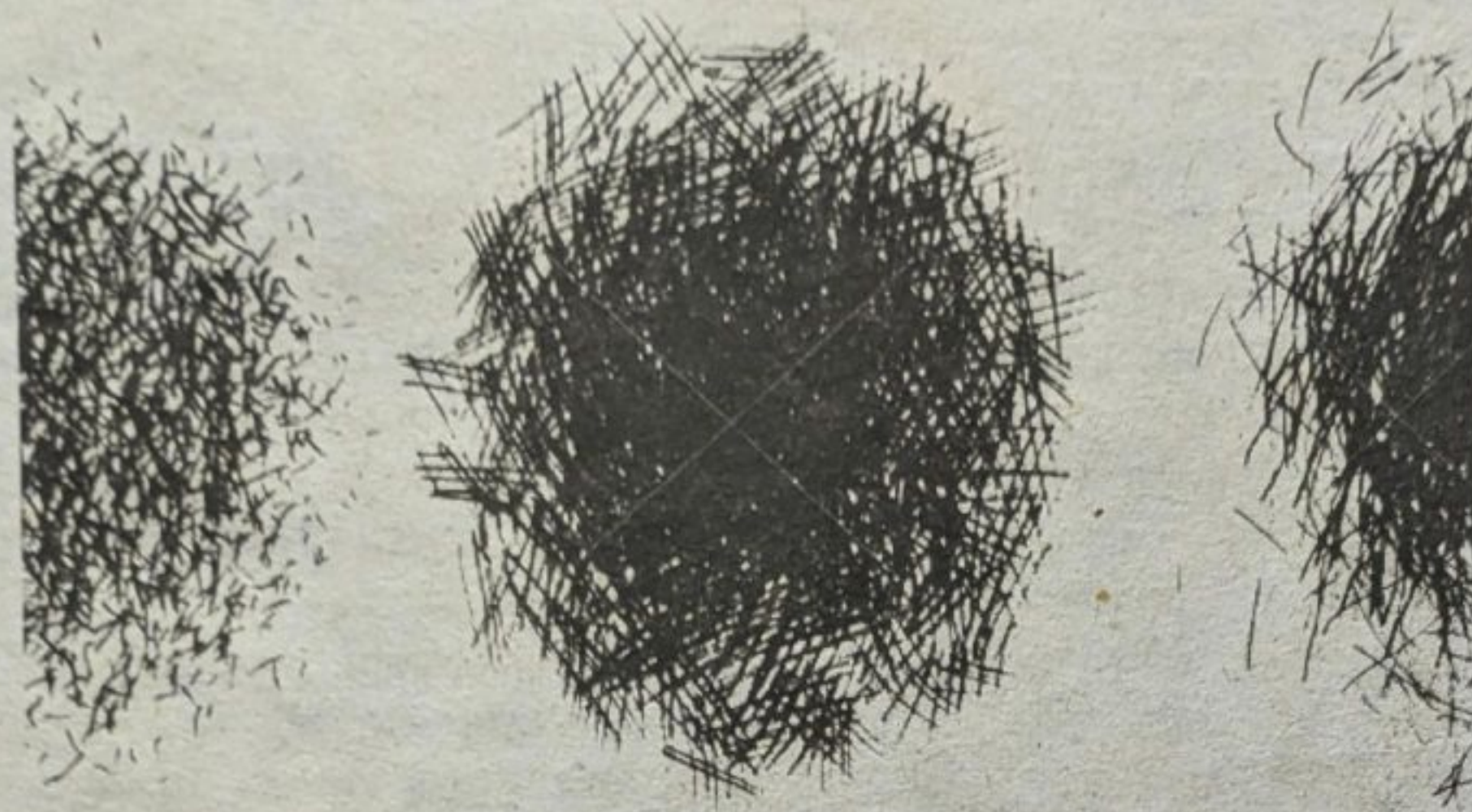
—হে শাইখ, আমাদের কি মসজিদেও আগুন নেভাতে তাদের সাহায্য করা উচিত না?

শাইখ গলা পরিষ্কার করলেন

—হে বৎস! যারা আগুন নেভানোর কাজ করেছে তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের লোক আছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বিদআতি, কেউ কেউ ফুসসাক আর আমাদের জামাআহ এসব থেকে মুক্ত। যদি আমরা তাদের সাহায্য করতে যাই, তবে আমাদের মধ্যে তাদের অকল্যাণ প্রবেশ করবে। একজন ছাত্রের দিকে তাকিয়ে আদেশ দিলেন—

—তুমি পড়া শুরু করো, বারাকাতুয়া ফীক।

কিন্তু ছাত্রটি কিতাব থেকে পড়া শুরু করার আগেই একটা বিকট শব্দ তাদের হতচকিত করে দিলো। শাইখসহ সকলেই দরজার দিকে ছুটে গেলেন। কিন্তু দরজাটা কোনক্রমেই খুলছিল না। আর তখনই তাদের চোখের সামনে তাদের ঘরের দেয়াল ধ্বসে পড়তে শুরু করলো এবং চারদিক থেকে আগুন তাদের দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করল।



যুক্তির আঘাতে মুক্ত করি চেতনার জট

ইবনু মুফাস্সিল

মূল এংজেল্ডা গোপন রেখে ধাপে ধাপে কাজ করাটা শয়তানের একটা কমন হাতিয়ার। যেমন আদম (আলাইহিস সালাম)-কে নিষিদ্ধ ফল খাওয়ানোর জন্য সে বলেনি, “যাও! আল্লাহকে অমান্য করো।”

সে বলেছে, “এটা খেলে তুমি ফেরেশতা হয়ে যাবে। অমর হয়ে যাবে।” [দ্র: কুরআন, ৭: ২০]

এছাড়া মূর্তিপূজার প্রচলন ঘটাতে শয়তান প্রথমে পূর্ববর্তী নেক ব্যক্তিদের সম্মানার্থে মূর্তি তৈরি করায়, কালক্রমে এসবের পূজা শুরু হয়। সূরা নূহের ২৩ নং আয়াতে আছে এমনই কিছু ব্যক্তি তথা মূর্তির নাম— ওয়াদ্দ, সুওয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক, নাসর।

নাস্তিকতা নামক ধর্মটি তার জগাবস্থায় এমনই ছিল। ধর্মের কথাগুলোকেই অদৃষ্টভাবে ঘোরাতো তারা। রবার্ট ব্রাউনিং রচিত Fra Lippo Lippi শিরোনামের একটা কবিতায় দেখা যায়— লিপো একজন চার্চ-সন্ন্যাসী যাকে জোর করে চার্চে আনা হয়েছে। ধর্মীয় পেইন্টিং আঁকা তার কাজ। একসময় সে বেশ্যালয়ে গমন করে। সাধু-সন্তু না এঁকে নারী আঁকতে শুরু করে। যুক্তি দেয় “নারীদেহ তো গডেরই সৃষ্টি। নারীদেহ এঁকে আমি গডের মহিমা খুঁজে পাই।” (উল্লেখ্য, এমনটা ধরে নেয়া ঠিক না যে, কবির নিজস্ব মতও এটাই)

এভাবেই শুরু। তারপর এই ধারণা প্রচারিত হতে শুরু করে যে পরম সত্য বলে কিছু নেই, সবই interpretation (খেয়াল করবেন, নিজেকেই পরম সত্য বলে দাবি করাটা কি ধর্মের বৈশিষ্ট্য?). ধর্মীয় বিশ্বাসগুলোকে চ্যালেঞ্জ করার একটা ভিত্তি এভাবে দাঁড়ালো। কিছু বৈজ্ঞানিক অনুমান যখন নাস্তিকতার পক্ষে এলো, তখন থেকে আত্মবিশ্বাসের সাথে নাস্তিকতা একটি ধর্ম হিসেবে আবির্ভূত হলো।

অদ্ভুত ব্যাপার হলো, নাস্তিকতা একসময় ধরেই নিলো যে, সে সত্য। অন্যান্য যে কোনো ধর্মের মতো সে নিজেও যে প্রশ্নের উর্ধ্বে নয়, তা বেমালুম চেপে গেল। নাস্তিকদের কথাবার্তা থেকেই তা স্পষ্ট হয়। ধারণা কেউ বলল, “আমি ফেমিনিজম নিয়ে একটা লেকচার দিচ্ছিলাম, কিন্তু শ্রোতা তার ধর্মাত্মতার জন্য শুনতেই চাইলো না।” হতেও তো পারে বক্তার কথা। শ্রোতার ধর্মবিশ্বাসই ঠিক। কিন্তু ধর্ম ধরেই নিয়েছে নাস্তিক হওয়ার কারণে সে-ই সঠিক (উল্লেখ্য, ফেমিনিজম মানেই নাস্তিকতা নয়। কেবল উদাহরণ দেয়া হয়েছে)।

মুসলিমরা যদি নিজেদের ‘শান্তিকামী’ পরিচয় দেয় তাহলে সেটা ‘মুসলিম’ এর প্রতিস্থাপক হবে না। কারণ এতে পক্ষপাতিত্ব হয়। মুসলিমরা শান্তিকামী হলে অমুসলিমরা কি অশান্তিকামী? অথচ নাস্তিকরা দিব্যি নিজেদেরকে ‘প্রগতিশীল’, ‘মুক্তমনা’ বলে বেড়ায়। ধর্মগুরুদের নিয়ে চটি লিখে অনলাইন ভরিয়ে ফেলা নাস্তিকেরাও নাস্তিক প্রগতিশীল। এমনকি মিডিয়াতেও এসব শব্দই ব্যবহৃত হয়! এসব শব্দ বলতে হয় কারণ ‘নাস্তিক’ কথাটাই গালির মতো শোনায়। ‘প্রতিবন্ধী’ বা disable-কে যেভাবে শুদ্ধ করে বলা হয় ‘specially able’, নাস্তিকদের প্রগতিশীলতাও এমনই।

নাস্তিকতার যেহেতু লিখিত বিধিবিধান নেই, এটা একেক জায়গায় একেকটা ঢাল ব্যবহার করে। যেমন বিজ্ঞান। এদের ধারণা বিজ্ঞান এদের নিজস্ব সম্পত্তি। মরিস বুকাইলির লেখা “বাইবেল কুরআন ও বিজ্ঞান” বইটা

মুসলিমরা যদি নিজেদের 'শান্তিকামী' পরিচয় দেয় তাহলে সেটা 'মুসলিম' এর প্রতিস্থাপক হবে না। কারণ এতে পক্ষপাতিত্ব হয়। মুসলিমরা শান্তিকামী হলে অমুসলিমরা কি অশান্তিকামী? অথচ নাস্তিকরা দিব্যি নিজেদেরকে 'প্রগতিশীল', 'মুক্তমনা' বলে বেড়ায়। ধর্মগুরুদের নিয়ে চটি লিখে অনলাইন ভরিয়ে ফেলা নাস্তিকেরাও নাস্তিক প্রগতিশীল। এমনকি মিডিয়াতেও এসব শব্দই ব্যবহৃত হয়! এসব শব্দ বলতে হয় কারণ 'নাস্তিক' কথাটাই গালির মতো শোনায়। 'প্রতিবন্ধী' বা disable-কে যেভাবে শুদ্ধ করে বলা হয় 'specially able', নাস্তিকদের প্রগতিশীলতাও এমনই।

পড়ে তসলিমা নাসরিন দাঁত কিড়মিড়িয়ে লিখেছিল, "মোল্লারাও আজকাল বিজ্ঞান চর্চা করে।" এত শত কোটি নাস্তিকের মাঝে কয়জন আর বিজ্ঞানী? অনেকেই আর্টস কমার্স পড়ে। বিজ্ঞানের ব্যাপারে এদের জ্ঞান খুব সরলীকৃত। বৈজ্ঞানিক সত্য আর তত্ত্বের পার্থক্য অনেকেই করতে পারে না। কিছু শুনলেই বলে "বিজ্ঞান বলে..."। আচ্ছা, বিজ্ঞান তো কোনো ব্যক্তি নী। বিজ্ঞান বলে মানে বিজ্ঞানীরা বলেন। বিবর্তনবাদের জটিল আলাপে গেলাম না। একজন মুসলিম বলবে "শয়তানের প্ররোচনাই হাই উঠে।" নাস্তিক বলবে, "কিন্তু বিজ্ঞান তো বলে অস্ত্রিজেনের অভাবে হাই ওঠে।" উইকিপিডিয়ায় গিয়ে দেখেন এই তত্ত্ব বহু আগেই ভুল প্রমাণিত। হাই উঠার আসল কারণ কী, একজনের দেখাদেখি আরেকজনের হাই উঠে কেন এসব আজও এক রহস্য।

এবার আসুন নীতি-নৈতিকতার প্রশ্নে। এটা নাস্তিকদের জন্য সবচেয়ে অস্বস্তিকর ফীল্ডগুলোর একটি। এখানে তারা দেখে কোন্টা মানলে ধর্মীয় বিধানের বিপরীতটা করা যায়। তাই তারা ইসলামের প্রাণের বদলে প্রাণ নীতির বিরুদ্ধে। কিন্তু যুদ্ধাপরাধ ইস্যুতে এসে লেগেছে প্যাঁচ। অনেকে বলেছিল, এই একটা মৃত্যুদণ্ডই তারা চায়, তারপর আর না। তসলিমা নাসরিন বলেছিল, সে যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসি চায় না। বাঙালিরা তখন আন্তিক-নাস্তিক নির্বিশেষে তাকে ধুয়েছে। আরজ আলি আর হুমায়ুন আজাদরা মরে গিয়ে বেঁচে গেছে। কখনো ভেবে দেখেছেন সব নাস্তিক কেন 'মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তি'? কারণ পাকিস্তান ইসলামকে ঢাল বানিয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধকে ব্যবহার করলে তাই ধর্মকে পঁচানোর একটা সুযোগ পাওয়া যায়। নরওয়ে বা ইরানি আর বাংলাদেশ মিলে যদি এক বল হতো, তারপর ভারপ্রাপ্ত প্রশ্নে -বাংলাদেশ যদি আলাদা হতো, তখন আকারদের দাড়ি টুপি না-ও থাকতে পারতো। দেশ-কাল-পাত্র নির্বিশেষে নৈতিকতার কথাও ধরুন। সমকামিতা তাদের কাছে ব্যক্তিস্বাধীনতা কেন? কারণ ধর্ম এটা নিষিদ্ধ করেছে। অপেক্ষা করুন। অযাচার, মৃতকামিতা, পশুকামিতাও শীঘ্রই ব্যক্তিস্বাধীনতা হয়ে যাবে।

নাস্তিকদের অন্ধবিশ্বাসের আরেকটা উদাহরণ দিয়ে শেষ করছি। ধর্মিকদেরকে তারা বলে জন্মগত ধর্মিক, বাবা মা আন্তিক বলে সন্তানও আন্তিক। আর তারা বুদ্ধি বিবেচনা করে নাস্তিক। বাবা মা থেকে আলাদা হওয়াটাই যদি বুদ্ধি বিবেচনার লক্ষণ হয় তাহলে তো হুমায়ুন আজাদের ছেলেও অন্ধবিশ্বাসী, বাপের দেখাদেখি নাস্তিক। বুদ্ধি বিবেচনা খাটিয়েই কি কেউ বাপ মায়ের ধর্ম বেছে নিতে পারে না?

'প্রগতিশীলতা'র তাসের ঘর ফুঁ দিলেই পড়ে যায়। চটকদার শব্দশৈলিতে ঘাবড়ে না গিয়ে ফুঁ-টা দিতে হয়। শয়তানের চক্রান্ত অতিশয় দুর্বল।

৩৯ পৃষ্ঠার পর

এতক্ষণ অনেক নেগেটিভ ঘটনা শেয়ার করলাম। এবার আসি বর্তমান অবস্থায়। ছোটখাট আরো অনেক ঘটনা-দৃষ্টিনায় আমার পরিবার এখন বুঝে গেছে আমি কী চাই, কতটা সিরিয়াসলি চাই! আর ঝামেলা করেনি। না পর্দা নিয়ে, না অন্য কিছু নিয়ে। এখন যেখানেই যাই-আমাকে সবাই আমার পরিবেশটাই তৈরি করে দেয়। বাসায় কেউ আসলে আমি সামনে কেন গেলাম না সিচুয়েশনটা আমার মা, বাবা, বোন সামলে নেয়। খালামনি দেশে আসার সময় সবার জন্য এটা ওটা আনলেও আমার জন্য এনেছে বোরকা, নিকাব, এস্তগুলো হাতমোজা, পা মোজা, মিসওয়াক এসব...।

সন্দেহযুক্ত খাবার কেউ দিলে আপুরা জিজ্ঞেস করে, অমুক এ খাবারগুলো পাঠিয়েছে, তুই কি এটা খাবি? কোনো আংকেল আসলে যখন বাবার কাছে জিজ্ঞেস করে আমি কোথায়, সে-ই ছোটবেলায় দেখেছিল। বাবা তখন ভূবন জয়ের হাসি দিয়ে বলে, আমার মেয়েটা একটু অন্য জগতে চলে গেছে! আপনার সামনে আসবে না।

পর্দা করার শুরুর দিকের অসুবিধাগুলো খুবই লিমিটেড তাই বলে ফেলা যায়, কিন্তু পর্দা করার পর এত এস্ত সুবিধা যে, তা কখনো বলে শেষ করা যাবে না।

শুধু এটুকু বলি, যে মানুষগুলো আমার জন্য বাধা তৈরি করত সেই মানুষগুলোই এখন আমার জন্য পরিবেশ তৈরি করে দেয়, আলহামদুলিল্লাহ!

যারা দীনের পথে নতুন আসতে চাচ্ছেন অথবা শুরুর দিকের ঝামেলাগুলোতে হতাশ হয়ে পড়েছেন, তাদের বলছি-প্লিজ! মাত্র কয়েকটা দিন ধৈর্য ধরে আপনার লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে চলতে থাকুন। আপনার সামনে এমন একটা জীবন অপেক্ষা করেছে, যে জীবন এতদিন শুধু কল্পনাই করেছেন। মাত্র ক'টা দিন। নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। হতাশ হবেন না প্লিজ। আজকে যারা নিশ্চিত্তে আল্লাহর পথে চলছে, গতকালও তারা বহু যুদ্ধের পথ অতিক্রম করে এসেছে।



মিসকিন উমর এর দু'টি কবিতা

মিসকিন

মহান স্রষ্টা সব দিয়েছেন,
করেননি কমবেশি,
শুধু চেয়েছেন তারই আনুগত্য
করব দিবানিশি।

অলসতা আর অবহেলায়
সময় হচ্ছে পার,
জীবনে আমার এলো বুঝি
গভীর অন্ধকার।

দীনবিজয়ের পথে আমি
করতে পারিনি কিছু,
বিবেক আমায় ধিক্কার দিয়ে
ছুটছে পিছু পিছু।

তাওয়াগীতের চলছে শাসন
মুসলিম-খুনে যমিন লাল,
তবুও বলো চেয়ে চেয়ে
দেখব কতকাল?

অস্ত্র হাতে যুদ্ধের মাঠে
যেতে আমায় হবে,
যতদিন এই যমিনে
তাগুতেরা রবে।

জানি না এ পৃথিবীতে
বাঁচব কতকাল,
জিহাদ নাহি করলে আমার
হারাবে পরকাল।

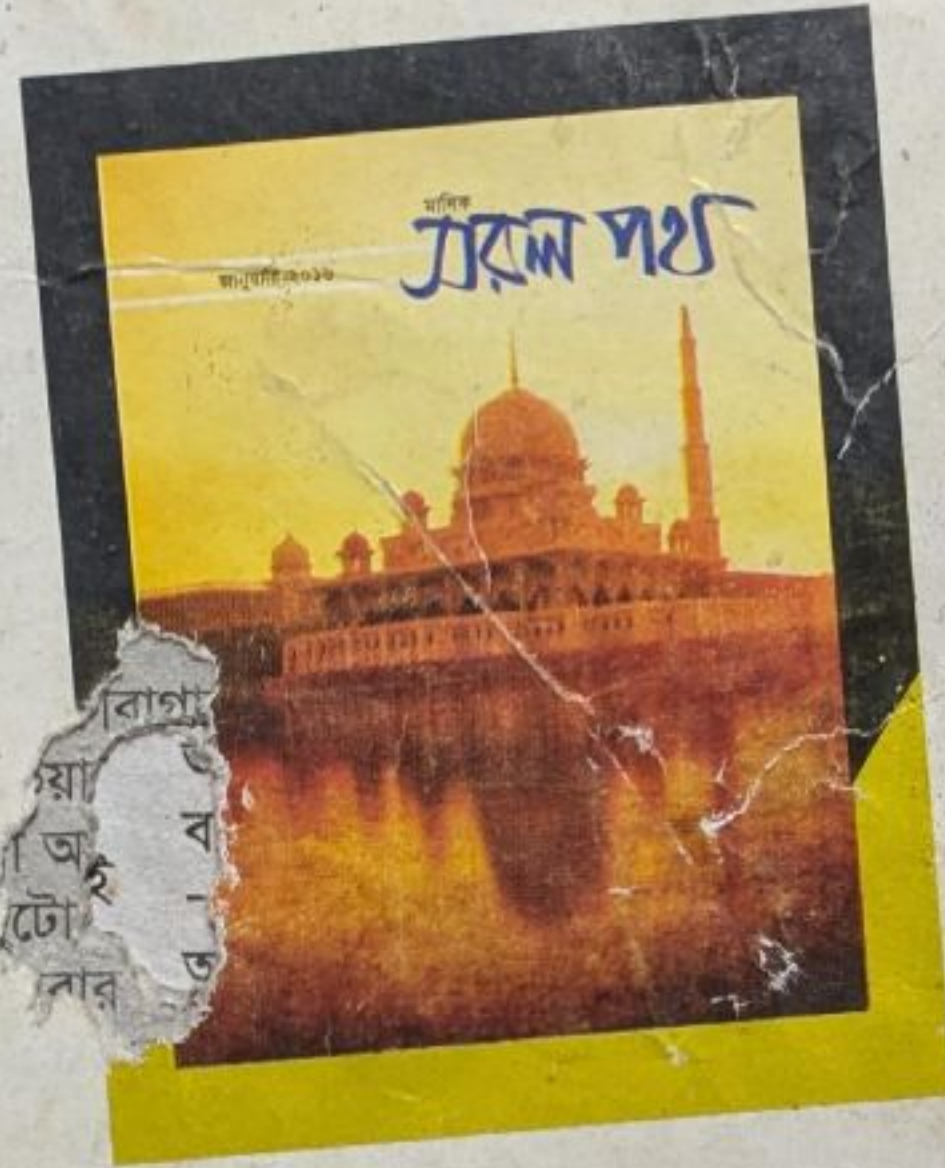
ওগো রহীম! অতীতের ভুল
ক্ষমা করে দাও,
কিতালের জন্য এ মিসকিনকে
কবুল করে নাও।

শপথ

রিক্সা চালিয়ে দীনবিজয়ের কাজ করেছেন যারা,
সারা বাংলায় কিতালের সুর বাজিয়েছিলেন তারা।
কিতালের মাঠ তৈরি করে খাঁসির মধ্যে ঝুলে,
নিরবে ঘুমিয়ে আছেন তুল গাছের তলে।
শত কষ্ট, শত দুঃখ, শত গর পরে—
জিহাদের আওয়াজ পৌঁছেছে বাংলার ঘরে ঘরে।
তারা ছিলেন খাঁটি মুজাহিদ, নির্ভিক, ত্যাগীমনা,
শাহাদাত ভিন্ন অন্য কিছু করতেন না কামনা।
কাঁধে কাঁধ রেখে চলতেন তারা দীন কায়েমের কাজে,
তাদের রেখে যাওয়া কাফেলায় কেন ভাঙনের সুর বাজে?
কিতালের কথা শিখলে তোমরা যাদের সাথে চলে,
আজ কেন অজুহাত দেখিয়ে তাদেরই গেলে ভুলে?
আমাদের উৎখাত করতে যখন তাগুতেরা করছে তাড়া
আমরা কি সব এক হব না কিতালি আকীদার যারা?
ওহে বন্ধু! হাতে হাত রাখো সামনে কত কাজ,
তাগুত মুক্ত যমিন গড়তে শপথ করো আজ!



মাসিক
এবল সথ



পড়ুন

লিখুন

শরিক হোন
মুকাতিলীনদের
এই জামাআতে

প্রশ্ন, পরামর্শ, মন্তব্য ও
যেকোন প্রয়োজনে

alburqan2015@gmail.com

www.facebook.com/alburqan